ভিলা-মাধবী

সুবোধ ঘোষ

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২ ॥

প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৭০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৭০

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং

ব্লক মুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ইউনিয়ন বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

দাম : তিন টাকা

এই লেখকের :

পলাশের নেশা
ভারত প্রেমকথা
শতকিয়া
বসন্ত তিলক
ফসিল
মন ভ্রমরা
জতুগৃহ
কুসুমেষু
ছায়ামৃগ
নবীন শাখী
সীমন্ত সরণি
অমৃতপথ যাত্রী
ভারতের আদিবাসী
তিলাঞ্জলি
ভিতর দুয়ার
সায়ন্তনী
নাগলতা
রূপসাগর
কিংবদন্তীর দেশে
ত্রিযামা
শ্রেয়সী
একটি নমস্কারে
শুন বরনারী
বর্ণালী
জলকমল
পুতুলের চিঠি
নিত সিঁদুর
ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস
কালপুরুষের কথা
বহুত মিনতি
দিগঙ্গনা
নিকষিত হেম

বাড়িটার নাম ভিলা মাধবী। ছোট একটি পাহাড়ী টিলার উপর বাংলো ধাঁচের এই বাড়িটার চওড়া বারান্দার সামনেই আড়া-আড়ি একটি সারিতে অনেকগুলি ইউকালি-পটাস। গাছের সাদা-সাদা ধড় যেমন নিরেট, তেমনই নিখুঁত ও সোজা তাদের খাড়াই চেহারা। কোনদিন কোন ঝড়ের আঘাতে যদি গাছগুলির মাথা ভেঙ্গে পড়ে যায়, তবে মনে হবে, সাদা-সাদা নিরেট থামের ধড় দাঁড়িয়ে আছে। আর ভিলা মাধবীর এই বাংলো ধাঁচের চেহারাকেও বোধহয় ছোট একটা পার্থেননের ধ্বংস বলে মনে হবে।

ভিলা মাধবীর ফটকের কাছে সড়কের পাশে একটি সাইনপোস্টের লেখা জানিয়ে দেয়—হাজারিবাগ টাউন, টু মাইলস্। কিন্তু টাউনের প্রায় সকলেই জানে যে, এই ভিলা মাধবী হল সেন সাহেবের বাড়ি।

সেন সাহেবের নাম যে সুজীবন সেন, এটা অবশ্য টাউনের সকলেই জানে না। কিন্তু আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু, যাঁরা দু'জন একদিন এলাহাবাদের ছাত্র ছিলেন, তাঁরা জানেন, এলাহাবাদের বিখ্যাত ডাক্তার পি সেনের ছেলে সেই সুজীবন সেন অনেক শখ করে আর পয়সা খরচ করে প্রায় পাঁচ বছর হল এই বাড়িটা তৈরি করিয়েছে আর নাম দিয়েছে; ভিলা মাধবী।

ভিলা মাধবীর ফটকের আর্চের জাফরিগুলিকে জড়িয়ে

ধরে যে লতার ভার সবুজ হয়ে ঝুলছে, সেটা আইভিলতা; মাধবীলতা নয়। ভিলা মাধবীর এত বড় লন আর হাতার কোথাও কোন মাধবীলতা নেই। তবু নামটা ভিলা মাধবী হল কেন?

এটা অবশ্য টাউনের কেউই জানে না। জানেন শুধু মিসেস চৌধুরী, যিনি এক বুড়ী মেমসাহেবের কারবারের পার্টনার হয়ে টাউনের বাইরের এই চমৎকার হোটেলটিকে দশ বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন; হোটেল সিংহানি। জায়গাটার গেঁয়ো নাম সিংহানি। ভিলা মাধবীর ফটক থেকে সড়ক ধরে মাত্র দশ মিনিট হেঁটে এগিয়ে গেলেই হোটেল সিংহানিকে দেখতে পাওয়া যায়, জানলার আর দরজার যত ময়ূরকণ্ঠি রঙের পর্দা ফুরফুর করে উড়ছে।

হোটেল সিংহানির ওই মিসেস চৌধুরী জানেন, সুজীবন সেন তার স্ত্রী মাধবীর নামটিকেই ভালবেসে আর পছন্দ করে বাড়িরও নাম রেখেছে ভিলা মাধবী। মাধবী যে মিসেস চৌধুরীর জেঠতুতো দিদির মেয়ে। আর, সুজীবন সেনের স্ত্রী মাধবীর কাছে এই মিসেস চৌধুরী আজও শুধু রেবা মাসিমা। বিধবা রেবা মাসিমার দুই ছেলে, গনেশদা আর কার্তিকদা, দু'জনেই এখন লণ্ডনে থাকে। আর; চিরকাল সেখানেই থাকবে বলে মনে হয়।

টাউনের লোক জানে, সেনসাহেব হলেন একজন কৃতী জিওলজিস্ট। আগে জিওলজির সার্ভেতে কাজ করতেন। তারপর কিছুদিন উড়িষ্যার এক দেশী স্টেটের খনিজ সন্ধানের ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও বেশি দিন টিকে থাকতে

পারেন নি সেনসাহেব। তবু তাঁর কাজের সুনাম আছে। তাই এখনও মাঝে-মাঝে ডাক আসে। ঝরিয়ার মাইন্‌স্ বোর্ড পরামর্শ নেবার জন্যে ডাকাডাকি করে। কোডারমা'র অভ্রখনি মালিকেরা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন। তাই সেনসাহেব এখনও মাঝে-মাঝে ঘোরা-ফেরা করেন। কোথাও গিয়ে একটু সার্ভে করে দিয়ে ফিরে আসেন ; কোথাও বা কিছুদিনের জন্য খনির কাজ তদারক করেন। পরামর্শ তো প্রায়ই দিয়ে থাকেন। এর জন্য যে-পরিমাণের ফী পান সেনসাহেব, সেটাও যেমন-তেমন নয়। এক হাজার টাকার কমে কোন কথাই বলতে রাজি হবেন না সেনসাহেব। এই সেনসাহেবই জানকীলাল যমুনাদাসকে অ্যাসবেসটস আর সোপস্টোনের খোঁজ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এটাও টাউনের অনেকের জানা আছে, বিশেষ করে আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু জানেন, সেনসাহেবের জীবনে এটুকু আর্থিক রোজগার না থাকলেও বিশেষ কোন অসুবিধা হত না। ডাক্তার পি, সেন অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। শুধু এলাহাবাদে নয় ; কলকাতাতে আর পুরীর সমুদ্রের ধারে সব মিলিয়ে তেরটি বাড়ির ভাড়া থেকে যে আয় হয়, তার উপর নির্ভর করে সেনসাহেব অনায়াসে সারাজীবন শুধু শিকার করে আর হুইস্কি খেয়ে পার করে দিতে পারবেন ; টাকার কোন অভাব হবে না।

এই খবরটা কিন্তু টাউনে প্রায় সকলেই জানে, সেনসাহেব একটু বেশী ড্রিঙ্ক করেন আর শিকারের শখে বড় বেশি পয়সা খরচ করেন। এত গুণী ও কৃতী জিওলজিস্ট হয়েও কোথাও

যে একজন স্থায়ী অফিসার হয়ে টিকে থাকতে পারলেন না, তার আসল কারণ বোধহয় সেনসাহেবের ওই দুটি অভ্যাসের বাড়াবাড়ি। জ্বর হয়েছে; টেম্পারেচার এক শো একেরও বেশি; ডাক্তার বলেছেন, এক পা'ও নড়বেন না, ঘরের ভিতরে চুপটি করে শুয়ে পড়ে থাকুন; কিন্তু ডাক্তারের উপদেশে কোন ফল হয় নি। বিকেল হতেই গ্যারেজ থেকে নিজেই গাড়ি বের করে, একগাদা বুলেট আর কার্তুজ আর চার'শো বোরের কর্ডাইট রাইফেলটি সঙ্গে নিয়ে শিকারে বের হয়ে গিয়েছেন। এ-খবরও টাউনের অনেকেই জানে।

বছর চল্লিশ বয়স হবে, সেনসাহেব মানুষটিকে টাউনের অনেকেই বেশ পছন্দ করে। সাজে পোশাকে একেবারে খাঁটি সাহেবী স্টাইলের মানুষ, হাতে সব সময়েই একটি পাইপ ধরে আছেন, আর চোখে ও মুখে সব সময়েই বেশ মিষ্টি একটি হাসি লেগে আছে। লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারও খুব ভাল। হাটের দিনে সড়কে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের বুড়োর কাছ থেকে কুমড়ো কিনে নিয়েই বুড়োকে হাসিমুখে ধন্যবাদ জানান—থ্যাঙ্ক ইউ। টাউন ক্লাবের ছেলেরা স্পোর্টসের জন্য চাঁদা চাইতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন। আর বেশ হাসিমুখেই ছেলেদের হাতের কাছে সিগারেটের ডিবে এগিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা অবশ্য লজ্জিতভাবে হেসেছে—সিগারেট খাই না। সেনসাহেব বলেছেন—তা হলে চা খেয়ে যাও।

টাউনের কারও সঙ্গে সেনসাহেবের মেলা-মেশা নেই; কিন্তু সে-জন্য সেনসাহেবের নামে কোন নিন্দের কথা কারও

মুখে শোনা যায় না। সেনসাহেব একটু অদ্ভুত মানুষ, কিন্তু বেশ ভাল মানুষ।

সেনসাহেবের এই পরিচয় ছাড়া টাউনের মানুষ আর শুধু এইটুকু জানে যে, সেনসাহেবর স্ত্রী আছেন আর একটি মেয়ে আছে। সেনসাহেবের স্ত্রী একজন সত্যিকারের সুন্দরী ; আর ছোট মেয়েটিরও কি চমৎকার ফুটফুটে চেহারা।

ভিলা মাধবীর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ধানক্ষেতের আর রোগা-রোগা খেজুরগাছের ভিড়ের ওপারে সেণ্ট কলাম্বাস কলেজের রেনেসাঁ স্টাইলের বাড়িটাকে দেখা যায়। কলেজের সায়েন্সের ছাত্রেরা মাঝে-মাঝে অদ্ভুত একটা কৌতূহল নিয়ে ভিলা মাধবীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা সেনসাহেবের মিউজিয়াম দেখতে চায়। আসল কথা হল, ওরা এই অদ্ভুত মানুষটিকেই একটু কাছে থেকে দেখতে চায়। সেই সঙ্গে দেখে যায়, হাজার রকমের পাথর নুড়ি আর খনিজের নমুনা হাজার রকমের চেহারা নিয়ে একটি ঘরের কাঠের গ্যালারিতে, কাচের আলমারিতে আর মেহগনির টেবিলে সাজানো রয়েছে।

অনেকদিন পরে আজ আবার একদল ছাত্র সেনসাহেবের মিউজিয়াম দেখতে এসেছে। সেনসাহেব নিজেই বেশ খুশি হয়ে আর হেসে-হেসে ছেলেদের হাতে আতসী কাচ ধরিয়ে দিয়েছেন—দেখ, বেশ ভাল করে দেখে নাও। এসব খুবই অদ্ভুত জিনিস। ভেরি ভেরি ইণ্টারেস্টিং চার্মিং অ্যাণ্ড রোমান্টিক।

কত রকমের সিলিকা স্লেট আর কেওলিন। ঝকঝকে অভ্র আর কাল্‌চে ম্যাঙ্গানিজ পাথর। সেনসাহেব নিজেও বলে দেন, এদিকের এগুলি হল যত ফেরাস আর অ্যালুমিনাস ল্যাটারাইট। পাথরের আকার-প্রকার দেখে ছাত্র ছেলেরা কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, কিন্তু সেনসাহেবকে বেশ বুঝতে পারে। সত্যিই বেশ ইন্টারেস্টিং আর চার্মিং মানুষটি। আর, রোমান্টিক তো নিশ্চয়ই। তা না হলে এমন চমৎকার এক রূপসী নারীর এত বড় একটা ছবিকে এই মিউজিয়ম ঘরের মাঝদেয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন কেন ?

ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ সাহস করে একটা প্রশ্ন করেই ফেলে—আপনি এই লাইনে কেমন করে এলেন, স্যার ?

হেসে ফেলেন সেনসাহেব, সুজীবন সেন।—শখ করে। ছেলেবেলা থেকেই শখ ছিল জিওলজি শিখব; আর পাথরের রোমান্স দেখব।

—কেন শখ হল স্যার ?

সুজীবন সেন দাঁত দিয়ে পাইপ চেপে ধরে আবার হাসেন। —বিখ্যাত জিওলজিস্ট রায় বাহাদুর পি, এন, দত্ত ছিলেন আমার ঠাকুরদার বন্ধু। তাঁর নাম নিশ্চয় শুনেছ ?

—না।

—তিনি বরাকর নদীর কিনারাতে কাঁকরের স্তর থেকে জুরাসিক কালের জানোয়ারের ফসিল বের করেছিলেন। দত্তদাদুর কাছে সেই যে পাথরের গল্প শুনলাম, সেই গল্পই মনে শখ ধরিয়ে দিল। হ্যাঁ...বুঝতে পারছ, চিনতে পারছ, এগুলি কী ?

—না।

—এগুলি খুব দামী পাথরের ছোট ছোট ক্রিস্টাল ; বাংলা ভাষায় বলে রত্নপাথর। দেখতে খুব সুন্দর, নয় কি ?

—হ্যাঁ স্যার।

—কিন্তু কেন সুন্দর বলতে পার ?

—না স্যার।

—ওর মধ্যে ইমপিওরিটি আছে। তার মানে ময়লা আছে ; ভেজাল আছে ; তার মানে অন্য একটা ধাতু ঢুকে পড়েছে। এই ইমপিওরিটি আছে বলেই সামান্য পাথর এত সুন্দর রঙীন রত্নপাথর হয়ে গিয়েছে। কেমন ? ব্যাপারটা বেশ রোমান্টিক কি না ?

—খুব রোমান্টিক। আপনি জিওলজিতে নিশ্চয় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন স্যার ?

—হ্যাঁ।

—মার্কের রেকর্ড ব্রেক করেছিলেন ?

—হ্যাঁ। আর, চাকরি ছাড়বার রেকর্ডও ব্রেক করেছি। এই আট বছরে এগারটা চাকরি নিয়েছি আর ছেড়েছি।··· আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমি এখনই বের হব। শুনলাম, চাতরার জঙ্গলে একদল নীলগাই দেখা দিয়েছে।

ড্রাইভার মতিরাম গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে ফটকের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখে। শিকারে যাবার এই ব্যস্ততার মধ্যেও সুজীবন সেন কিন্তু একটা কথা বলে যেতে ভুলে যান না।—আমি যাচ্ছি মাধু। এক একদিন অবশ্য এমনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, ঘরের ভিতরে এসে কথাটা বলতে পারেন না।

বাইরের লনের কাছে দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে কথাটা বলে দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়েন।

সুজীবন সেনের স্ত্রী মাধবীলতা সেন একেবারে একটি স্তব্ধ মূর্তির মত ভিতরের একটি ঘরের কোচের উপর বসে খোলা দরজার পাশে কাচের টবের মেরি-গোলাপের সদ্যফোটা স্তবকটার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকেন। গাড়ির শব্দ যখন আর শোনা যায় না, তখন ঘরের বাইরে এসে ডাক দেন মাধবীলতা—স্টিফান।

—জী হুজুর। সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে খানসামা স্টিফান।

—সাহেব আজ কি কি চীজ সঙ্গে নিয়ে গেল ?

—একটা শেরি আর একটা হুইস্কি।

—ঠিক আছে ; যাও।

সুজীবন সেনের স্ত্রী, সেনসাহেবের দশ বছরের ঘরোয়া জীবনের সঙ্গিনী মাধবীলতা সেন আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে কোচের উপর চুপ করে বসে থাকেন।

সন্ধ্যা হয় যখন, ভিলা মাধবীর ঘরে-ঘরে আর বারান্দায় আলো ঝলমল করে, তখন আয়ার হাত ধরে বাইরে থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসে আট বছর বয়সের রঞ্জু, সুজীবন সেনের মেয়ে রঞ্জিতা সেন ; মুখটা সদ্য-ফোটা মেরি-গোলাপেরই মত একটা সুন্দর ফুল্লতা।

রাতের খাবার খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে রঞ্জু। মাধবীলতা সেন পিয়ানোতে হাত রেখে ঘুমপাড়ানী সুর বাজিয়ে একটা ঘণ্টা সময়ও পার করে দেন। কিন্তু তার পরেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতা তখন টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে আর কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসেন।—তোমাদের আশার কোন মানে হয় না, মা। শোধরাবার কোন লক্ষণ দেখছি না। আগে কোনদিনও একথা মনে হয় নি যে, জিওলজিস্ট মানে পাথরের মানুষ। এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি। এখান থেকে সরে গিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকতে পারলে অন্তত একটু হাঁপ ছাড়তে পারতাম।

চাতরার জঙ্গলে নীলগাইয়ের সন্ধান পান নি সুজীবন সেন। জঙ্গলের গাঁয়ের কাছে মাচান করে আর পুরো দুটি রাত জেগে ফিরে এসেছেন। হ্যাঁ, একেবারে খালি হাতে ফেরেন নি। একটা জংলী ময়ূর আর এক গাদা তিতির নিয়ে এসেছেন। বোধহয় গাঁয়ের সাঁওতালদের কাছ থেকে কিনেছেন। আর, একটা পাহাড়ী নালার কিনারা থেকে পাথরের একটা চাক্‌লা তুলে নিয়ে এসেছেন। পাথরের ভাঁজের মধ্যে সিঁদুরের মত রঙীন একটা পুরু রেখার দাগ; সুজীবন সেন বলেন—বুঝতে পারলে তো মাধু, পাথরটার মধ্যে কী সুন্দর মার্কারির স্ট্রেন লালচে হয়ে রয়েছে।

কিন্তু মাধবীলতার চোখে কোন বিহ্বলতার স্ট্রেন সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে না। বরং; কেমন যেন শুকনো ঝরঝরে একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। এই ভদ্রলোকের কাছে জীবন্ত ময়ূর আর তিতির যেন মিথ্যে পদার্থের একটা স্তূপ; আর এই

পাথরের চাক্‌লাটাই একটা জীবন্ত প্রাণী। গাড়ির কেরিয়ারের সঙ্গে বাঁধা পাখিগুলির পালক ধুলোয় ভরে গিয়েছে। কিন্তু পাথরের চাক্‌লাটাকে কত যত্ন করে গাড়ির ভিতরে সীটের গদির উপরে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত মানুষই বটে। এমন মানুষ কেমন করে মনে রাখবেন যে, এই এক বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও তিনি তাঁর স্ত্রীকে আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে একটু বেড়িয়ে আসেন নি।

বাড়িতে থাকলেই বা কি? কতদিন নিজের চোখেই তো বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছেন সুজীবন সেন, বিকেল বেলা লনের চারিদিকে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নারী, তাঁরই স্ত্রী, যার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ বছর, যার জীবনে অনেক আশা এখনও রঙীন হয়েই আছে, যাকে দেখতে পেলে পথের মানুষ এখনও চোখ অপলক করে একটা রূপের বিস্ময় দেখতে থাকে; তবু তার পাশে পাশে বেড়িয়ে একটা ঘণ্টাও গল্প করবার জন্য কোন ইচ্ছে এই মানুষকে ব্যস্ত করে তোলে নি। শুধু মাধু মাধু বলে হঠাৎ এক-একবার খাম্‌কা ডাক দিয়েছেন। বড় জোর কাছে এসে পাঁচ-দশ মিনিটের মত দাঁড়িয়েছেন। তারপরেই উসখুস করেছেন। তখুনি ঘরের ভিতরে গিয়ে আলমারি খুলে শেরির বোতল আর গেলাস বের করেছেন।

চাতরার জঙ্গল থেকে শিকার করে ফেরা আর দু'রাত জাগা সুজীবন সেনের মূর্তিটাকে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন মাধবীলতা। সুজীবনের বাঁ চোখের ভুরুর কাছে একটা ক্ষত লালচে হয়ে রয়েছে। হাত-ঘড়িটার কাচের অর্ধেকটা নেই।

সরে যান মাধবীলতা। ড্রাইভার মতিরামকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—কি হয়েছিল ?

মতিরাম—সাহেব মাচান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।

—কেন ?

—একটু বেশী খেয়েছিলেন।

মাঝ রাতে যখন একটা সোফার উপরে সুজীবন সেনের নেশার শরীরটা অলস জড়তার মত এলিয়ে পড়ে থাকে, তখন মাধবীলতা বিছানা থেকে উঠে এসে সুজীবন সেনের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছেন সুজীবন সেন। কে জানে এখন কিসের স্বপ্ন দেখছেন। জগতের কোন্ বনের গোপন-লোকে রাত্রির অন্ধকারে নীলগাই ক্ষিদের জ্বালায় কচি শালের পাতা খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারই বুকে গুলী মারবার জন্য এই অদ্ভুত ভদ্রলোকের আত্মাটা এখনও বোধহয় এই ঘুমের মধ্যেও ছটফট করছে।

জঙ্গলের নীলগাইয়ের নাগাল পান নি ভদ্রলোক; কিন্তু এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতার প্রাণের নাগাল তো পেয়েছেন। কাজেই, তার প্রাণটকে একরকম মেরেই রেখেছেন।

সুজীবন সেনের ঘুমন্ত চোখ দেখতে পায় না, তাঁর মাধবী-লতার চোখ দুটো এখন কেমন অদ্ভুত হয়ে জ্বলছে। মাধবীলতা বোধহয় তাঁর অদৃষ্টের একটা ভয়ানক ঠাট্টার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না মাধবীলতা। আত্ম-

হত্যার মানুষ যেমন উতলা হয়ে ট্রেনের চাকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ছুটে যায়; মাধবীলতাও যেন তেমনই একটা প্রতিজ্ঞার আক্রোশের মত উতলা হয়ে ছুটে গিয়ে পাশের ঘরের টেবিলের দেরাজ ধরে টান দেন। রঙীন নক্সাকরা চামড়ার একটি ব্যাগ বের করেন। ব্যাগটাকে উপুড় করে নাড়া দিতেই ঝুরঝুর করে একগাদা চিঠি ঝরে পড়ে।

মাধবীলতার হাত দুটো ছটফট করতে থাকে। তবে কি, চিঠিগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে, একেবারে বাজে কাগজের কুচি করে দিয়ে, বাগানের পাঁচিলের ওপারে কালো অন্ধকার আর ঝড়ো বাতাসের মধ্যে এখনই উড়িয়ে দিতে চান মাধবীলতা ?

টেবিলের এই দেরাজটি হল সুজীবন সেনের জীবনের পাঁচটি বছরের যত অভাবিত প্রাপ্তির মিউজিয়াম। চাইতে হয় নি, চেষ্টা করতে হয় নি, এক তরুণী নারীর ভালবাসার চিঠি বার বার এসে সেদিনের সুজীবন সেনের মনটাকে বিস্ময়ে ভরে দিয়েছিল। অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতা রায়েরই চিঠি। বিয়ের আগে তিন বছর আর বিয়ের পরে দু' বছর; সুজীবন সেনের কাছে লেখা মাধবীলতার চিঠির ভাষা যেন সুখী-ভালবাসার গানের ভাষা। বিয়ের আগের একটি তারিখের মাধবীলতার একটি চিঠি বলছে, "জানি না তোমার মন কি বলে? কিন্তু আমি জানি, আমি তোমাকেই ভালবাসি। ভালবাসতে পার আর না-ই বা পার, বিয়ে করতে রাজি হও বা না হও, আমাকে মিথ্যেবাদী বলে মনে করো না।" বিয়ের পরের একটি তারিখের চিঠি বলছেঃ "আমি তো আমার আশার বেশী কিছু পেয়ে গিয়েছি।"

একটিও চিঠি হারিয়ে যায় নি; হারিয়ে যেতে দেন নি সুজীবন সেন। মোট একান্নটা চিঠি। দেখলে মনে হবে, চিঠিগুলিকে রত্নপাথরের একান্নটা ক্রিস্টাল মনে করে এই টেবিলের দেরাজের ভিতরে একটি গোপন জাদুঘরের মধ্যে পুষে রাখতে চেয়েছেন জিওলজিস্ট সুজীবন সেন।

কিন্তু ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতে সোনার মেডেল বিজয়িনী, ইতিহাসের ছাত্রী মাধবীলতা আজ বোধহয় এই চিঠিগুলিকে একটা মিথ্যে স্বর্ণযুগের যত প্রশস্তির প্রলাপ বলে মনে করছে। টেবিলের দেরাজের ভিতরে সুজীবন সেনের গোপন জাদুঘরের ভিতরে যেন একগাদা মিথ্যে শিলালিপি লুকিয়ে রয়েছে।

চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকেন মাধবীলতা। তারপর, চিঠিগুলিকে আবার ব্যাগের ভিতরে ভরে দিয়ে দেরাজের সেই গোপন নিভৃতেই রেখে দিলেন।

আলো নিবিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে যাবার আগে অন্য একটি ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিলেন মাধবীলতা, বিছানাতে শুয়ে আছেন সুজীবন সেন। না, এই পাঁচ বছরের মধ্যে কোনদিনও ওই বিছানার কাছে এগিয়ে যেতে ইচ্ছেই করে নি।

ঘুমন্ত পাথর অবশ্য নিজেই এক-একদিন চমকে জেগে উঠেছে, মাধবীলতার কাছে এসেছে আর হাত ধরেছে। কিন্তু একটুও ভাল লাগে নি মাধবীলতার; শুধু সহ্য করেছেন, এই মাত্র। আজ কিন্তু ভাবতে গা ঘিন-ঘিন করে। যেন আর সহ্য করতে না হয়।

সকালবেলা চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মাধবীলতা বেশ গম্ভীর হয়ে কথা বলেন—আমি এলাহাবাদ যাব।

সুজীবন হাসেন—যেও। কিন্তু কথাটাকে এরকম একটা ভয় দেখানো স্বরে বলছ কেন ?

মাধবী—কথা হল, আমি এখন এলাহাবাদেই বেশ কিছুদিন থাকব।

—থেক।

—কিন্তু তুমি আবার সপ্তাহে একটা করে টেলিগ্রাম করে উপদ্রব করবে না।

—সেটা আমার অভ্যেস। না করে থাকতে পারব বলে মনে হয় না।

—না ; চলে আসবার জন্যে ওরকম তাড়া দেবে না। আমার বিশ্রী লাগে। বাড়ির মানুষও হাসাহাসি করে।

—তা করুক। আমার যা ভাল লাগে আমি তা করবই।

সুজীবন সেন অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন। আর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মাধবীলতার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেন—এখন এলাহাবাদে গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকতে তোমার কি আর এমন ভাল লাগবে ? তার চেয়ে চল না কেন, মাস তিন-চারের মত অনেক দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

মাধবী—কোথায় ?

সুজীবন—ইওরোপে।

মাধবী—একথা তো পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি। একটা মিথ্যে কথা।

সুজীবন—আঃ, এমন সুন্দর মুখে এত শক্ত কথা শোভা পায় না। সত্যি, বিশ্বাস কর মাধু, সব ব্যবস্থা প্রায় ঠিক হয়েই গিয়েছে।

মাধবীলতার মুখের গম্ভীরতা হঠাৎ চমকে ওঠে।—কথাটা আমাকে আগে বলতে কী বাধা ছিল? আমি কি আপত্তি করতাম?

—না; হঠাৎ বলে দিয়ে তোমাকে একটু আশ্চর্য করে দেবার ইচ্ছে ছিল, তাই আগে বলি নি।

আশ্চর্য হবারই কথা। যে-মানুষ তার অদ্ভুত এক সাধের জীবনের সীমানা পার হয়ে এই পাঁচ বছরের মধ্যে একবার সিমলা-দার্জিলিংও যেতে পারে নি, সে মানুষ বিদেশে বেড়াতে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। জঙ্গলের জন্তু আর পাখি শিকার করবে, পাথর কুড়বে, ভিলা মাধবীর একটি ঘরের সোফার উপর বসে যখন-তখন গেলাস ভর্তি হুইস্কি চুমুক দিয়ে দিয়ে খাবে, আর স্ত্রী মাধবীলতা শুধু একটি রঙীন রূপের মূর্তি হয়ে চোখের সামনে ঘুর-ঘুর করবে; কী অদ্ভূত একটা জীবন তৈরি করে ফেলেছে এই ভদ্রলোক! হ্যাঁ, রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একবার মেয়েটাকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবে আর গালে একটা চুমো খাবে। বাস্, তার পরেই কে যে স্ত্রী আর কে যে মেয়ে, সেটুকু বোঝবার দেখবার আর জানবার যেন কোন আর দরকারই বোধ করেন না এই সুজীবন সেন। সে মানুষেরই মনে স্ত্রীকে আর মেয়েকে নিয়ে ইওরোপ বেড়াবার সাধ হয়েছে।

মাধবীলতা নিশ্চয় একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু

একটুও খুশি হতে পেরেছেন কি? পারেন নি বোধ হয়; তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কোন প্রসন্নতার চিহ্ন সুস্মিত হয়ে ফুটে ওঠে না। এ যেন ট্রেন ছেড়ে যাবার পর টিকেট কেনবার ব্যস্ততা। আলো নিবে যাবার পর মুখ দেখবার চেষ্টা। মাধবীলতার মুখের হাসি তো সাত বছর আগেই শুকিয়ে গিয়েছে! আজ হঠাৎ সুজীবন সেনের একটা খেয়ালী কথার ধ্বনি শুনে সে রিক্ততা সব আক্ষেপ ভুলে গিয়ে হেসে উঠতে পারবে কেন? এক বছর বয়সের রঞ্জুর জন্মদিনের উৎসবে সুজীবন সেনের সঙ্গে সেই যে হেসে কথা বলেছিলেন মাধবী-লতা, তারপর আর কোনদিন কখনও হেসে কথা বলতে কিংবা কোন কথা বলে হেসে ফেলতে পেরেছেন বলে মনে পড়ে না।

মাধবীলতা বলেন—এতদিন পরে হঠাৎ বাইরে বেড়াতে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?

সুজীবন—ভেবে দেখেছি, আমার একটু পরিবর্তন দরকার।

সুজীবন সেনের মুখে খুবই নতুন একটা কথা বটে; কিন্তু মাধবীলতার মনে নতুন করে কোন আশার চমক জাগিয়ে তুলতে পারবে, এমন কোন কথা নয়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের বাড়ি থেকে সুজীবন সেনের কাছে কম করেও ত্রিশটি চিঠি এসে অনুরোধ আর আবেদন করেছে, তোমার এখন একটু পরিবর্তন দরকার, সুজীবন। সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমা নিজেও কতবার এসেছেন; সুজীবনের সঙ্গে কত মিষ্টি করে কথা বলে অনুরোধ জানিয়েছেন, তোমার একটু পরিবর্তন দরকার সুজীবন। কিন্তু কোন আবেদন আর অনুরোধ সুজীবন সেনের জীবনে

পরিবর্তনের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা কিংবা ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে পারে নি। সেই মানুষ আজ হঠাৎ বলছে, একটা পরিবর্তন দরকার। ভাল কথা ; কিন্তু নিতান্ত একটা কথা। ওটা কোন অনুতপ্ত জীবনের নতুন ও কঠিন একটা অঙ্গীকারের কথা নয়।

মাধবীলতা শুধু বলেন—এটুকু ভেবে দেখতে এত দেরি না করলেই ভাল ছিল।

সুজীবন হেসে ওঠেন।—ঠিক কথা।

সুজীবন সেনের পরিবর্তন? হ্যাঁ, জাহাজের দুটো-তিনটে দিন সত্যিই স্ত্রীকে আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ডেকের উপর ঘুরে-ফিরে অনেক গল্প করেছেন। কিন্তু তারপরেই হাঁপিয়ে উঠেছেন।—নাঃ, এসব কি আমার পোষায়?

মাধবীলতা—কি হল?

—সমুদ্র দেখতে যে এত বিশ্রী লাগবে, সেটা আগে ধারণা করতে পারি নি।

একদিন বিকেলে হঠাৎ একটা আক্ষেপ করে সেই যে জাহাজের সেলুন-বারের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন সুজীবন সেন, বের হয়ে এলেন রাত দশটায়। টলতে টলতে কেবিনে ফিরে এসে দেখলেন, মাধবীলতা আর রঞ্জু দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রথমে নেপল্‌স্; জাহাজ থেকে নেমেই যেন একটা স্বস্তির আনন্দ পেলেন সুজীবন সেন। যেন সমুদ্র-দেখা যন্ত্রণার গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে গেল কঠিন পাথুরে জগতের একটি স্থলচর প্রাণ।

নেপল্‌স্ থেকে ট্রেনের যাত্রী হয়ে আর রোমে এসে একটা হোটেলে উঠে, একটা ঘণ্টাও পার না হতেই খুশি হয়ে হেসে ফেললেন সুজীবন সেন। —সত্যিই বেশ জায়গা মাধু। জিনিস-টিনিস যেমন ভাল তেমনি সস্তা।

মাধবীলতারও বুঝতে দেরি হয় নি, এরই মধ্যে কোন বিস্ময়ের স্বাদ পেয়ে এত খুশি হয়ে গিয়েছেন সুজীবন সেন।

হোটেলে এসেই একবার বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন, আর বেশ একটি লালচে তৃপ্তির উচ্ছলতা দিয়ে চোখ-মুখ রঙীন করে নিয়ে আবার হোটেলের ঘরে ফিরে এসেছেন।

সুজীবন সেনের মুখে হাসি আছে, কিন্তু মাধবীলতার মুখে কোন হাসির একটা ছায়াও নেই। রোম হলে কী হবে? মাধবীলতার প্রাণটা এখানেও এসে যেন হাজারিবাগের জঙ্গলের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে। সে ছায়াতেও কাঁটা আছে।

সুজীবন সেন অবশ্য একটা পরিবর্তনের কাণ্ড দেখাবার জন্যে মাঝে মাঝে বেশ চেষ্টা করেন; কিন্তু হাঁপিয়েও পড়েন বোধ হয়। পর পর পাঁচটা দিন সুন্দরী রোম নগরীর অনেক পিয়াৎসার অনেক ফোয়ারার কাছে ঘুরে বেড়িয়েছেন সুজীবন সেন। একটা মিউজিয়ামও দেখেছেন। কলোসিয়ামের একটি নিরালাতে দাঁড়িয়ে মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করেছেন। দেখে হেসেও ফেলেছেন, রঞ্জুর তাড়া খেয়ে একটা সাদা বিড়াল ছুটে পালিয়ে গিয়ে একেবারে এরিনার ঠিক মাঝখানে লাফিয়ে পড়েছে আর রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মিউ-মিউ করেছে।

সুজীবন সেন হাসেন—তোমার হিস্ট্রির কী দশা হয়েছে দেখ।

মাধবীলতা—কি হয়েছে?

সুজীবন—দেখে নাও, সেই খুনে গ্ল্যাডিয়েটর আজ কেমন একটি বিল্লি হয়ে এরিনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিউ-মিউ করছে।

হাসবার মত একটা কথা বটে, কিন্তু মাধবীলতার মুখে কোন হাসির ঝিলিক উথলে ওঠে না।

কাপিটলের মিউজিয়মের কয়েকটা মূর্তির দিকে তাকাতে গিয়ে সুজীবন সেন বেশ একটু শিউরে উঠে হেসে ফেলেন—ভাল ভাল জাতের পাথরকে কেটে-ছেঁটে নির্লজ্জ করবার কী অদ্ভুত চেষ্টা! চল, হোটেলে ফিরে যাই।

যেখানেই যান না কেন, ক্ষণে ক্ষণে শুধু একটি কথা বার বার বলে মাধবীলতার গম্ভীর মুখটাকে আরও গম্ভীর করে দিয়েছেন সুজীবন—চল, হোটেলে ফিরে যাই। সন্ধ্যে হলে হোটেল থেকে মাঝে মাঝে বের হলেও দূরে যেতে চান না সুজীবন।

এই তো হোটেলের সামনেই বেশ সুন্দর এই রাস্তাটি, ভিয়া নাশিওনাল। এই রাস্তা ধরে সামান্য একটু এগিয়ে গেলেই পিয়াৎসা এসেদ্রা। ফোয়ারার গায়ে রঙীন আলোর ঝিলমিলি খেলছে। মাধবীলতা আর রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে এসেদ্রার চারদিকে ঘুরে, তারপর ফুটপাথের চাতালের উপর খোলা আকাশের নীচে কফি-বারের একটা চেয়ারে বসে কফি খেতেও মন্দ লাগে না। মাধবীলতা শুধু চুপ করে পাশের চেয়ারে বসে থাকেন। আর রঞ্জু শুধু চকোলেট খায়।

পথের ভিড়ের মেয়েরা দেখতে পেয়েই যেন বেশ অশ্চর্য হয়ে চমকে উঠে, এক রূপসী ভারতীয়া কফি-বারের চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। মাধবীলতার শাড়ি-জড়ানো শরীরের শোভা আর ভঙ্গি আরও ভাল করে দেখবার জন্যে মেয়েদের ভিড় আরও কাছে এসে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে। কোথা থেকে কোন এক কাগজের ফটোগ্রাফার ব্যস্তভাবে এসে আর খুট-খাট করে ক্যামেরা ঘুরিয়ে মাধবীলতার ফটো তুলে নিয়ে চলে যায়।

উঠে দাঁড়ান সুজীবন।—চল; এবার হোটেলে ফিরে যাই।

স্ত্রীকে আর মেয়েকে নিয়ে পৃথিবীর কোন কোলাহলের আর চঞ্চলতার মধ্যে বসে থাকতে বা ছুটোছুটি করতে সুজীবন সেনের বোধহয় একটুও ভাল লাগে না। তাই বাইরে বেড়াতে বের হয়েও হোটেলে ফিরে যাবার জন্য তাঁর প্রাণটা এরকম চল-চল করতে থাকে। একান্তভাবে নিজেরই একটি ছোট্ট নিরালা ঠাঁই, যেখানে তিনি তাঁর শেরির বোতল ও গেলাস নিয়ে বসে থাকবেন; আর মাধবীলতা ও রঞ্জু তাঁর চোখের কাছাকাছি কোন বারান্দা বা করিডর, কোন লন বা লতাপাতার ঝোপঝাড়ের কাছে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে; বাস্ এর চেয়ে ভাল ঘরোয়া সুখ আর কি হতেই বা পারে?

কিন্তু এই কি ইউরোপ বেড়াবার রকম? এভাবে হাজারিবাগের সিংহানি হোটেলের একটা ঘরে পড়ে থাকলেই তো ইউরোপ বেড়ানো হয়ে যেত। এত দূরে আসবার কোন দরকার ছিল না। মাধবীলতার মনের ভিতরে চাপা বিক্ষোভের জ্বালাটা এই পাঁচটা দিন নীরব হয়ে থাকলেও আজ আর মুখর না হয়ে থাকতে পারে না।—এবার দেশে ফিরে গেলেই তো হয়।

সুজীবন সেনও বলে ওঠেন।—ঠিক বলেছ, আমারও ফিরে যেতেই ইচ্ছে করছে।

হোটেলে ফিরে এসে রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে আর লিফ্‌ট ধরে উপরতলায় চলে যান মাধবীলতা। ঘরে ঢুকেও সমস্যায় পড়েন মাধবীলতা সময় কাটবে কি করে?

কিন্তু সুজীবন সেনের কোন সমস্যা নেই। হোটেলের বারে তিনটি ঘণ্টা সময় পার করে দিয়ে উপরতলায় আসেন; আর ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠেন—যাই বল, ভিলা মাধবীর মত আরামের জায়গা এই রোমা নগরীতেও কোথাও নেই। একেবারেই নেই। যত সব হট্টগোলের হোটেল।

পাইপ ধরিয়ে আর মুখ ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে সুজীবন সেন মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভেবে নিলেন; তারপর বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠেন—হ্যাঁ এবার ফিরে যাবার জন্যেই তৈরি হতে হবে। কিন্তু তোমার যদি আরও কিছু দেখবার ইচ্ছে থাকে, তবে দু'চারটে দিন ঘুরে ফিরে দেখে নাও। হোটেলওয়ালা বলেছেন, ইংরেজি-জানা ভাল গাইড দিতে পারবেন।

মাধবীলত—কোন দরকার নেই।

সুজীবন সেন আর হোটেল ছেড়ে বের হতে চান না। কিন্তু মেয়েটা বাইরে বেড়াবার জন্যে ছটফট করে বলেই মাধবীলতা বিকেল হলে একবার বের না হয়ে পারেন না। কোথায় আর যাবেন? হোটেলের কাছাকাছি ওই এসেদ্রা।

একদিন, সন্ধ্যার ফোয়ারার গায়ে রঙীন আলোর ঝিলিমিলির দিকে তাকিয়ে মাধবীলতার চোখ দুটো যখন ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই চমকে উঠলেন মাধবীলতা। চোখের কাছে এসে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁকে যে চেনা-চেনা বলে মনে হয়।

ভদ্রলোক বলেন—আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

মাধবীলতা—হতে পারে।

—আপনি কি গণেশদার কেউ হন?

আশ্চর্য হয়ে আরও চমকে ওঠেন মাধবীলতা। —হ্যাঁ, রেবা মাসিমার ছেলে গণেশদা।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে হাসেন—তা হলে তো আপনাকে ঠিকই চিনেছি। আপনার রেবা মাসিমা আমারই কাকিমা। আমি পরিতোষ রায়। আমি অনেকদিন আগে আপনাদের এলাহাবাদের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম।

মাধবীলতা—হ্যাঁ, এইবার মনে পড়ছে। আপনি তো তখন লখনউ-এর আর্ট স্কুলে ছিলেন।

পরিতোষ—হ্যাঁ। আমি এখানেও প্রায় পাঁচ বছর হল ব্রঞ্জের আর মোজেয়িকের কাজ শিখছি।

রঞ্জুকে গাল টিপে আদর করেন পরিতোষ রায়। রঞ্জুরই একটা হাত ধরে আর মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ উৎফুল্ল স্বরে বলে ওঠেন। —চলুন, আপনাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি; আর মিস্টার।

মাধবীলতা—মিস্টার সেন।

পরিতোষ—মিস্টার সেনের সঙ্গে একবার দেখাও করে আসি।

টেবিলের উপর হুইস্কির গেলাস রেখে হোটেলের লাউঞ্জের এক কোণে বসে ছিলেন সুজীবন সেন। দুই চোখ টান করে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন; রঞ্জুর হাত ধরে এক অচেনা

ভদ্রলোক, আর সেই ভদ্রলোকেরই পাশে মাধবীলতা। যেন নতুন এক র‍্যাফায়েল অদ্ভুত একটা আশ্চর্যের রঙীন ছবি এঁকে সুজীবন সেনের চোখের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। যে মাধবী-লতার মুখে আজ সাত বছরের মধ্যে কোনদিনও হাসি দেখতে পান নি সুজীবন সেন, সেই মাধবীলতার মুখটাও হাসছে।

তার মানে, মাধবীলতার মুখের হাসি দেখতে পেয়েই সুজীবন সেনের মনে পড়েছে, এই সাত বছরের মধ্যে কোনদিনও মাধবীলতার মুখে হাসি দেখতে পাওয়া যায় নি। মাধবীলতার মনের আকাশের এক কোণে হঠাৎ যেন একটা সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠেছে, তারই ঝিকিমিকি হাসিটা মাধবী-লতার ঠোঁটের ফাঁকে কাঁপছে।

পরিতোষ রায়কে চিনতে পেরে খুবই খুশি হলেন সুজীবন সেন। —বিদেশে এসে হঠাৎ এভাবে একজন কুটুম্ব মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

পরিতোষ—এখানে আর কতদিন থাকবেন ?

সুজীবন—আমার তো আর একটি দিনও থাকতে ইচ্ছে করে না। তবে হ্যাঁ, বেচারী হিস্ট্রির ছাত্রীর মনে বোধহয় রোমের কীর্তি আর-একটু ভাল করে দেখবার ইচ্ছে আছে।

পরিতোষ—আপনার ইচ্ছে করে না কেন ?

সুজীবন—আমি তো আন-ন্যাচারাল হিস্ট্রি নই। আমি ন্যাচারাল হিস্ট্রি।

পরিতোষ—মিসেস সেন যদি বলেন, তবে আমিই গাইড হয়ে ওঁকে সাতদিনের মধ্যে রোমের আর্ট আর হিস্ট্রির অনেক ওয়াণ্ডার দেখিয়ে দিতে পারি।

মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে সুজীবন সেন হাসেন,—কি বলেন মিসেস সেন?

মাধবীলতা—আমার তো ইচ্ছে করেই।

সুজীবন—তাহলে দেখে নাও। না হয়, সাতটা দিন পরেই ভাবা যাবে, রোমে আর থাকা হবে কি হবে না।

সাতটা দিন পার হয়ে যাবার পরেও কিন্তু বুঝতে পারা গেল না, ঠিক কবে রোম ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব হবে। কারণ, মাধবীলতা নিজেই হেসে-হেসে বলে ফেললেন—সাতদিনে কি রোম দেখা শেষ হতে পারে? অসম্ভব। বলতে গেলে, এখনও কিছুই দেখা হয় নি।

সুজীবন—এই যে শুনলাম, কত কী দেখে এলে! কত ব্যাসিলিকা, কত চ্যাপেল, আর কত গ্যালারি।

মাধবীলতা—কিন্তু আরও যে কত কী রয়ে গেল! এখনও সীজারের ফোরাম দেখতে যাওয়া হয় নি। পরিতোষ বাবু বললেন, ভাটিকান গ্যালারির র‍্যাফায়েল রুমের ছবি ঠিক-ঠিক বুঝে দেখতে হলে এক মাস সময় লাগবে।

সুজীবন—না; এত দেরি করলে চলবে না।

মাধবীলতা—কেন? আর একটা মাস এখানে থাকতে অসুবিধের কি আছে?

সুজীবন—ভাটিকানের র‍্যাফায়েল রুম দেখতে এত সময় নিলে ওদিকে যে ভিলা মাধবীর সুজীবন রুম চামচিকেয় ভরে যাবে।

মাধবীলতা—এরকম বাজে কথার সঙ্গে তর্ক চলে না।

সুজীবন—না মাধু; ভিলা মাধবীর জন্যে সত্যিই আমার প্রাণ আই-ঢাই করছে। যাই হোক; এক মাস নয়, আর

দিন সাতের মধ্যে যা পার দেখে নাও। তারপর চল, সরে পড়ি।

সুজীবন সেনের মনটা বোধহয় সত্যিই একটা পরিবর্তন চেয়েছিল; কিন্তু সুজীবন সেনের আত্মাটাই বাধা দিয়েছে। রোমের এই হোটেলের লাউঞ্জে হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে বসে থাকলেও প্রাণটা ভিলা মাধবীর সেই ঘরটির জন্যেই আই-ঢাই করছে। আর, নেশার আবেশ যখন বেশ নিবিড় হয়ে উঠে, তখনও বোধহয় সুজীবন সেনের তন্দ্রার চোখ দুটো পিপাসিত হয়ে দেখতে থাকে, চাতরার জংলী গাঁয়ের অড়হর ক্ষেতের উপর রাতের জ্যোৎস্নায় নীলগাই চরে বেড়াচ্ছে। মোতিরাম, আমার রাইফেল? জলদি করো ম্যান! বিড় বিড় করে কথা বলে ফেলেন সুজীবন সেন।

লাঞ্চের পর রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে মাধবীলতা লাউঞ্জে এসে দেখতে পান, সুজীবন সেন তখনও হুইস্কির গেলাস সামনে রেখে বসে আছেন। কিন্তু সেজন্যে মাধবীলতার মুখের হাসির উজ্জ্বলতা নিবে যায় না। বড় জোর আর পাঁচ-সাত মিনিট পরেই পরিতোষ রায় আসবেন, আর রোমের বিস্ময় দেখাবার গাইড হয়ে মাধবীলতাকে ও রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে যাবেন। বরং মাধবীলতাকেই একটি চমৎকার পরিবর্তন বলে মনে হয়। ঠোঁটের ফাঁকে আর ছোট তারার ঝিকিমিকি হাসি নয়, সারা মুখে যেন ভরা চাঁদের হাসি ফুটে উঠেছে।

পরিতোষ আসেন। রঞ্জু খুশি হয়ে লাফাতে থাকে। যাবার আগে সুজীবনের দিকে তাকিয়ে রঞ্জু শুধু বলে যায়—আমরা আসি বাবা। রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে মাধবীলতা আর পরিতোষ সেন নতুন এক বিস্ময়ের জগতে বেড়াবার জন্য চলে যান।

লাঞ্চের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেজন্যে সুজীবন সেনের চিন্তায় কোন ব্যস্ততা নেই। লাউঞ্জের এক কোণের কোচের উপর বসে, আর, যেন ইচ্ছে করেই নেশার চোখের কাছে একটা তন্দ্রার সুখ তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। বিস্নুনগড়ের জঙ্গলের ভিতরে ছোট্ট নদী কোনারের স্রোত মস্ত বড় একটা পাথরের চটান ধুয়ে দিয়েছে। সুন্দর সাদা মোলায়েম পাথর। মার্বেল নাকি? জলদি করো মোতিরাম, কুলি বোলাও, ডিনামাইট লাগাও।

কল্পনার ডিনামাইট সত্যিই শব্দ করে ফেটে পড়ে না; কিন্তু চমকে ওঠেন সুজীবন সেন। না, আর এখানে এভাবে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। কালই নেপল্‌স্ রওনা হতে হবে। তারপর, প্রথম যে জহাজে জায়গা পাওয়া যাবে, সেই জাহাজেই দেশের দিকে পাড়ি দিতে হবে।

কিন্তু চলে যাবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞা করেও কিছুই করতে পারলেন না সুজীবন সেন। আরও একটা মাস পার হয়ে গেল। কী আশ্চর্য, মাধু কি অনন্তকাল ধরে রোমের বিস্ময় দেখে বেড়াবে আর একটুও ক্লান্ত হবে না? তা ছাড়া, রঞ্জুর কথা থেকেও তো বোঝা যায়, আজকাল প্রায় রোজই সন্ধ্যাটা পরিতোষের সঙ্গে অপেরা হাউসে কাটিয়ে দিয়ে

তারপর হোটেলে ফিরে আসে মাধু। মেয়েটারও অভ্যেস বদলে দিয়েছেন মেয়ের মা; রঞ্জু আজকাল ওর মার সঙ্গে রাত দশটায় হোটেলে ফিরে এসেও গুন গুন করে গান গায়, আগের মত ঘুমের ভারে রঞ্জুর চোখের পাতা আর নুয়ে পড়ে না।

সুজীবন জিজ্ঞাসা করলে রোজই একটা না একটা মিউজিয়ামের নাম বলে দেন মাধবীলতা, আজ নাকি সেখানে যাওয়া হবে। সেখানে নাকি চমৎকার মূর্তির কলেকশন আছে। মাধবীলতার ইচ্ছার কথাটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না। ওই তো, যত সব বিবসনা ভেনাসের মূর্তি। পরিতোষের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, ইরোস আর সাইকি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাধুর তো বরং একটু লজ্জা পাওয়াই উচিত।

আজ সকালবেলাতেই মাধবীলতার সাজ আর হাতের ঘড়িতে বার বার দেখবার ব্যাকুলতা দেখে সুজীবন সেন অনুমান করে নিয়েছেন, নিশ্চয় অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা হয়েছে। কিন্তু কোথায়? মাধবীলতাকে আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে না।

মাধবীলতাও পরিতোষের অপেক্ষায় লাউঞ্জের একেবারে ওদিকের একটি চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। কেউ যেন ঠাট্টা করে সুজীবনের বুকের পাঁজরের উপর খুব জোরে একটা টোকা মেরেছে। বেশ ব্যথা লেগেছে। হাতে-ধরা হুইস্কির গেলাসটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন সুজীবন সেন।

লাউঞ্জের ওদিক থেকে ছুটে আসে রঞ্জু। সুজীবনের গায়ের উপর এলিয়ে পড়েই আদুরে স্বরে একটা অদ্ভুত কথা বলে—বাবা, বল না?

সুজীবন—কি বলব?

রঞ্জু—আমার কাকে বেশী ভাল লাগে? তোমাকে, না পরিতোষ কাকাকে?

চমকে উঠলেন সুজীবন সেন। পাঁজরগুলি যে মট্ মট্ করে বেজে উঠেছে।

—এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ রঞ্জু?

রঞ্জু—মা জিজ্ঞেস করছিল।

সুজীবন—কবে?

রঞ্জু—কালকে।

সুজীবন—কোথায়?

রঞ্জু—পরিতোষ কাকার স্টুডিওতে।

সুজীবন—তুমি কি বললে?

রঞ্জু—আমি বলেছি, তোমাকে ভাল লাগে। পরিতোষ কাকাকেও ভাল লাগে।

রঞ্জু আবার লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল। সুজীবন সেন আবার হুইস্কির গেলাসের দিকে দুটো অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন।

পরিতোষ রায় আসেন। দূরে দাঁড়িয়েই সুজীবন সেনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আর মাথা হেলিয়ে একটা সৌজন্যের ভঙ্গি নিবেদন করেন।

চলে গেলেন পরিতোষ রায়, সঙ্গে মাধবীলতা আর রঞ্জু।

সঙ্গে সঙ্গে সুজীবন সেনও উঠে দাঁড়ান। হোটেলের অফিসের কাউণ্টারে এসে পকেটের ব্যাগ থেকে নোটের তাড়া বের করেন।—বিল প্লীজ; আমরা কাল সকালের ট্রেনে নেপল্‌স্ চলে যাব।

সন্ধ্যা হতেই ফিরে এসে যখন রঞ্জুর হাত ধরে হোটেলের ঘরে ঢোকেন মাধবীলতা, তখন সুজীবন সেন কোন কথা না বলে তাঁর সন্ধ্যার পিপাসা মেটাবার জন্যে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যান।

পরদিন সকালে, যখন ট্যাক্সি ডাকা হয়ে গিয়েছে, তখন সুবিমল সেন শুধু একটি কথা বলেন,—এখনই রওনা হব।

মাধবীলতা প্রায় এক মিনিট ধরে দুই চোখের তারা দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের ঝিলিক ধরে নিয়ে সুজীবন সেনের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলেন। একটিও কথা বললেন না।

ভিলা মাধবীর লনের সবুজের চারদিকে মরশুমী কসমসের বাহার সাংঘাতিক রঙীন হয়ে উঠেছে। রোমের হোটেলের বদ্ধ বাতাসে প্রাণটা যেন ভেপসে উঠেছিল। সুজীবন সেন তাই কসমসের ভিড়ের চারদিকে ঘুরে-ফিরে আর ইউকালিপ-টাসের বাতাস গায়ে মেখে এই দশদিনেরই মধ্যে মনে-প্রাণে বেশ ঝরঝরে হয়ে গিয়েছেন। হাঁপ ছেড়ে শরীরেরও জড়তা কাটিয়েছেন। আর, শিকারে বের হবার জন্যে তৈরিও হতে শুরু করেছেন।

মাধবীলতা বলেন—আমি এলাহাবাদ যাব।

সুজীবন—যাও।

মাধবী—এখনই যাব।

সুজীবন—যাও।

মাধবীলতা ডাক দেন—রঞ্জু, এদিকে এস।

সুজীবন—রঞ্জুকে কেন?

মাধবী—ওকে খাইয়ে নিই।

সুজীবন—কোন দরকার নেই।

মাধবী—কেন?

সুজীবন—রঞ্জু এলাহাবাদ যাবে না।

মাধবী—কে বললে যাবে না?

সুজীবন—আমি, রঞ্জুর বাবা বলছি।

মাধবী—রঞ্জু যদি এখানে থাকতে না চায়?

সুজীবন—থাকতে না চাইলেও থাকবে।

চুপ করে রইলেন মাধবীলতা। এলাহাবাদ রওনা হবার সব ব্যস্ততা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

দেখতে পেলেন মাধবীলতা, সন্ধ্যা হতেই হুইস্কির বোতল আর গেলাস নিয়ে, আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে লনের ভিতরে বসলেন সুজীবন সেন। দেখলেন, মাঝরাতও পার হয়ে যাচ্ছে, তবু সুজীবন সেনের নেশার শরীরটা লন ছেড়ে উঠতেই পারছে না।

কিন্তু ভোর হতেই যখন ব্যস্তভাবে রঞ্জুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে ঘরের দরজা খুলতে গেলেন মাধবীলতা, তখন একটা বাধা পেয়ে চমকে উঠলেন। বাইরে থেকে তালা বন্ধ। একটু পরেই বুঝতে পারলেন, কে-যেন তালা খুলে দিচ্ছে। দরজার বাইরে এসে দেখতে পেলেন মাধবীলতা, তালা আর চাবি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছেন জিওলজিস্ট সেন সাহেব। পাথরের মানুষ মাঝ-রাত পর্যন্ত বিষ গিলেও কত শক্ত হয়ে হাঁটছেন!

আজ বিকাল হলেই শিকারে বের হবেন সুজীবন সেন। ড্রাইভার মোতিরামকে জিজ্ঞেস করে আগেই জেনে নিয়েছেন মাধবীলতা।

বিকেল হল, গাড়ি নিয়ে শিকারেও বের হয়ে গেলেন সুজীবন সেন। কিন্তু মাধবীলতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখ-লেন, রঞ্জুকেও সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেল একটা নিদারুণ চতুর আর নির্মম সতর্কতা।

খানসামা স্টিফান মাধবীলতার কাছে এসে মাথা চুলকিয়ে যেন একটা সান্ত্বনার ভাষা শোনাতে চায়—মিস বাবার বিছানা

গরম জামা, খেলনা, কিতাব আর দুধ-বিস্কুট মাখন-ফ্রুট সবই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

মাধবীলতা—কোথায় কোন জঙ্গলে গেল তোমার সাহেব?

স্টিফান—শুনেছি তো দানুয়া ফরেস্ট বাংলোতে দুদিন থাকবেন।

আর তো বুঝতে কোন অসুবিধে নেই মাধবীলতার, বাপ তাঁর মেয়েকে এভাবেই আগলে রাখবেন; নেশার চোখও সব সময় সজাগ থাকবে আর পাহারা দেবে; মেয়ের মা যেন মেয়েকে নিয়ে পলাতকা হবার কোন সুযোগ না পায়।

চোখ জ্বলে, বুকের ভিতরে দুরন্ত একটা নিশ্বাস তপ্ত হয়ে ছটফট করে। লনের চারদিকের যত রঙীন কসমস দুপায়ে মাড়িয়ে সারাটা সন্ধ্যা শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে আর চোখ মুছে মুছে ঘুরে বেড়াতে থাকেন মাধবীলতা।

দুদিন পরে শিকারের সফর থেকে সুজীবন সেন ফিরে আসতেই মাধবীলতার চোখ দুটো ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। রঞ্জু নেই।

—রঞ্জু কোথায়? চেঁচিয়ে উঠলেন মাধবীলতা।

—রঞ্জুকে রাঁচিতে বড়দির কাছে রেখে এলাম। এখন ওখানেই থাকবে রঞ্জু।

ধীর স্থির ও প্রশান্ত স্বরে এইবার চরম কথাটা জানিয়ে দিলেন মাধবীলতা। —আমি চললাম।

সুজীবন—বলবার কোন দরকার ছিল না।

ভিলা মাধবীর গেট পার হয়ে চলে গেলেন মাধবীলতা, মুখ ফিরিয়ে পিছনে একবার তাকালেনও না।

ইউকালিপটাসের পাতা কেঁপে কেঁপে ঝিরিঝিরি শব্দ করে, গেটের আইভিলতা দুলে ওঠে, হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা খেয়ে গুলমোরের ঝরাপাতা মাধবীলতার পা ছুঁয়ে উড়ে চলে যায়। কিন্তু ওদেরই বা কি সাধ্যি আছে যে, আজ মাধবী-লতাকে থামিয়ে দিতে কিংবা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে? মাধবীলতা ভুলেই গিয়েছেন যে, উনিই হলেন ভিলা মাধবীর মাধবী।

সিংহানি হোটেল তো বেশি দূরে নয়। হেঁটে যেতে দশ মিনিটও লাগবে না। রেবা মাসিমাকে বললেই হবে, আপনার গাড়িটা একবার দিন, আমাকে রোড স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

মাধবীলতাকে হেঁটে বের হয়ে যেতে দেখে ড্রাইভার মোতিরাম নিজেরই বুদ্ধিতে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করেছে। এতক্ষণে বেশ জোরে স্পীড নিয়ে গেট পার হয়ে চলেই যেত মোতিরাম, কিন্তু চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন সুজীবন সেন।

হতভম্ব মোতিরাম, আতঙ্কিত মোতিরাম সাহেবের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে।

সুজীবন সেনও কি বুঝতে পারছেন যে, ভিলা মাধবীর মাধবী চলে যাচ্ছে? না, জঘন্য একটা ট্রেসপাসের মূর্তি চলে যাচ্ছে। সুজীবন সেনের বাগানের ফুল চুরি করতে ঢুকেছিল; হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে; আর ধমক খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু বাঘিনী আবার মরিয়া হয়ে তার বাচ্চার খোঁজে রাঁচিতে হাজির হবে না তো? হাজির হলেও কোন সুবিধে হবে না; বড়দিকে শাসিয়ে বলে দিয়ে এসেছেন সুজীবন সেন, —চারু রায়ের মেয়েকে যদি রঞ্জুর কাছে আসতে দাও, তবে তোমারই বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্রের মামলা আনব। সাবধান, যেন কোন ভুল না হয়।

বড়দি তাঁর ভাইকে ভাল করে চেনেন। ভাইয়ের কটকটে লাল চোখ আর নিশ্বাসের ভুরভুরে নেশার গন্ধ পেয়ে একটা আর্তনাদ চাপতে চেষ্টা করেছেন। বেশ ভয়ে ভয়ে বলেছেন. —আমাদের ভুল হবে না। কিন্তু এসব ঝগড়া তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেললেই ভাল হয় জীবু।

—এটা ঝগড়া নয় বড়দি। চেঁচিয়ে উঠেছেন সুজীবন সেন। চীৎকারের শব্দটা যেন সুজীবন সেনের আহত হৃদ্-পিণ্ডের আর্তনাদ।

বড়দি আশ্চর্য হয়ে বলেন—ঝগড়া নয়, তবে কি?

পকেট থেকে দুটো চিঠি বের করে বড়দির সামনে ফেলে দিয়েছেন সুজীবন সেন। —পড়ে দেখ।

রোম থেকে মাধবীলতার কাছে পরিতোষের যে চিঠিটা ব্যাকুল হয়ে এয়ারমেলে পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে, সেই চিঠি। আর, পরিতোষের কাছে মাধবীলতা যে সান্ত্বনার চিঠি লিখে বেয়ারা শুকদেওকে ডাকে ফেলতে দিয়েছিল, সেই চিঠি। দুটি চিঠি, যেন দুটি বিহ্বল স্বপ্নের ইচ্ছা আর স্বীকৃতির দলিল।

চিঠি দুটো পড়েই বড়দি চোখ বন্ধ করেন, কাঁপতে থাকেন। বড়দির দুচোখ থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটাও ঝরে পড়তে থাকে।

বুঝতে পেরেছেন বড়দি, ঝগড়ার ব্যাপার নয়; জীবনে-জীবনে শত্রুতার ব্যাপার। মিটিয়ে ফেলতে বললেই মিটিয়ে ফেলা যায় না। চারু রায়ের মেয়ে ভাগ্য বদল করতে চাইছে। বড়দির ভাই নেশার খুশিতে সব আঘাত ভুলে যায়, ক্ষমা করেও দিতে পারে, কিন্তু এই অপমানের আঘাত ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমা করা উচিতও নয়। দরকারই বা কি?

বড়দির চোখ দুটো এইবার বেশ শুকনো হয়ে, যেন একটা জ্বালা নিয়ে আর ক্ষমাহীন হয়ে কেঁপে ওঠে।—ঠিক আছে জীবু, রঞ্জু এখন আমার কাছেই থাকুক। চারু রায়ের মেয়েকে এ-বাড়ির গেটের কাছেও দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। কখ্খনো না।

চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতার ছায়া ভিলা মাধবীর গেট পার হয়ে চলেই গিয়েছে। এখানে এখন আর কোন সমস্যা নেই। বেশ জোরে একটা হাঁপ ছাড়লেন সুজীবন সেন।

চুপ করে সোফার উপর বসে হুইস্কির গেলাসে তিনটি চুমুক দিয়েই যেন চমকে ওঠেন। টেলিফোনে রাঁচির বড়দির সঙ্গে কথা বলেন।—হ্যালো বড়দি, রাক্ষুসী চলে গেল।

হুইস্কির বোতল অর্ধেক খালি হয়ে যাবার পর সুজীবন সেন বেশ আশ্চর্য হয়ে সন্দেহ করেন, কি ব্যাপার? খানসামা স্টিফান কি বোতলের হুইস্কিতে জল মিশিয়ে রেখেছিল? কোন স্বাদ নেই, তৃপ্তি নেই, নেশার আরাম জমে না; এ কী অদ্ভুত অস্বস্তি!

ভিলা মাধবীর সবই তো ঠিক আছে। টবের মেরি-গোলাপ আছে, কসমসের রঙীন ভিড় আছে। মালী চমনরাম,

ড্রাইভার মোতিরাম, খানসামা স্টিফান আর বেয়ারা শুকদেও, সবাই আছে। শুধু রাক্ষুসীটা নেই বলেই কি ভিলা মাধবী এত শূন্য হয়ে খা-খা করছে? না, শিকারে বেরিয়ে পড়াই ভাল। ভেলোয়ারা জঙ্গলের লেপার্ড আজকাল নিশ্চয় রাত্রির অন্ধকারে গাঁয়ের কুয়োর কাছে চৌবাচ্চার জল খাবার জন্যে আসে। এই বোশেখ মাসের গরমে জঙ্গলের কোন নদী আর নালাতে যে এক ফোঁটাও জল নেই।

হ্যাঁ, এলাহাবাদে প্লীডার প্রসাদবাবুকে এখনই সব কথা লিখে মামলাটা দায়ের করতে বলে দেওয়াই ভাল। দেরি করবার কোন মানে হয় না।

চিঠি লেখেন সুজীবন। কলমটা যেন কালির বদলে রক্ত দিয়ে একটা খুনের ইতিবৃত্ত লিখতে থাকে। উকিলের কাছে এসব কথা লেখবার কোন দরকার হয় না, তবু লিখেই ফেললেন সুজীবন—চারু রায়ের এই মেয়ে, ইতিহাসের মেডালওয়ালী এই নারী বোধ হয় নিজেকে একটি ক্লিওপেট্রা বলে মনে করেছে। পুরনো পুরুষকে খুন করবে আর নতুন একটাকে ধরবে, ওর প্রাণের মধ্যে এইরকম একটা ভয়ানক ইচ্ছার উৎসব আজ সাত বছর ধরে চলছে। সাত বছরের মধ্যে একটি দিনও আমার সঙ্গে হেসে কথা বলে নি। কেন হাসে নি সেটা আগে বুঝতে পারি নি। আজ বুঝতে পেরেছি, এ নারী মানবী নয়, একটা মাদী রেপটাইল। কাজেই, ডিভোর্স চাই। কেন চাই, সে-কথা আপনি সঙ্গের এই চিঠি দুটো

পড়লেই বুঝতে পারবেন। মামলার জন্যে যে-সব কাগজপত্রে আমার সই দরকার হবে, সেগুলি তাড়াতাড়ি পাঠাবেন। যদি দরকার মনে করেন, তবে মামলা তদ্বির করবার জন্যে ব্যারিস্টার ত্রিবেদীকে বলবেন। মোট কথা, পৃথিবী জেনে ফেলুক, চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতা একটি সুন্দরী বীভৎসতা। লোকে যেন বলে ঃ ইতরতা দাই নেম ইজ মাধবীলতা।

চিঠি লেখা শেষ করেই ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার উপর ছটফট করে পায়চারি করেন সুজীবন; যেন আগুন-লাগা একটা ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছেন, ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগিয়ে গায়ের জ্বালা একটু জুড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছেন।

খানসামা স্টিফানকে কাছেই দেখতে পেয়ে খাবার টেবিলের কাছে যখন এগিয়ে গেলেন সুজীবন, তখন হুইস্কির বোতলের থিতানিটুকুও আর নেই। সুজীবন সেনের কটকটে লাল চোখ বেশ ছলছল করতে শুরু করেছে।

—স্টিফান! চেঁচিয়ে উঠলেন সুজীবন।

—হুজুর। এগিয়ে আসে স্টিফান।

সুজীবন—যাবার আগে মেমসাহেব কি খাবার-টাবার কিছু খেয়েছিলেন?

—না হুজুর।

—তবে? তুমি একটি বেকুব।

খাবারের ডিসের উপর এলোমেলো করে চামচ আর কাঁটা চালিয়ে যা খেলেন সুজীবন সেন, সেটা খাওয়ার একটা ভঙ্গি মাত্র; প্রায় না-খাওয়া।

হাত ধুয়ে নিয়ে আবার এঘর-ওঘর করে, একটা মিথ্যে

ব্যস্ততার ছুটোছুটি সহ্য করতে গিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়তে থাকেন সুজীবন। বুঝতেও পারেন, হুইস্কির কড়া নেশাটাও আজকের এই শূন্যতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হেরে যাচ্ছে আর হাঁপিয়ে পড়ছে।

কিন্তু বেশ হবে। চারু রায়ের মেয়ের কলঙ্কটা প্রচার করে দিলে রঞ্জুর বাবার আর রঞ্জুর জীবনে কি ক্ষতি হবে? চারু রায়ের মেয়ে ওর সুন্দর মুখের হাসি নিয়ে নতুন করে দীপ জ্বালতে চায়, জ্বেলে ফেলুক। কিন্তু ওর মুখে বেশ ভাল করে কালি ছিটিয়ে দিতে হবে।

হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবলেন সুজীবন। নেশায় বিভোর বুকটা বোধ হয় ফুঁপিয়ে উঠল। তখুনি যেন একটা অদ্ভুত ঘুমের মধ্যে টলে টলে হেঁটে ঘরের ভিতরে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে উকিল প্রসাদবাবুর কাছে লেখা এত বড় চিঠিটাকে তুলে নিয়েই ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। নতুন করে লিখলেন—স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকতে রাজি নয়। কেন রাজি নয়, তা জানি না। সুতরাং, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না। তাই, ডিভোর্স চাই।

—শুকদেও, ইধার আও। এই চিঠিটা এখুনি ডাকে ফেলে দিয়ে এস।

চিঠি নিয়ে চলে যায় শুকদেও।

—মোতিরাম, গাড়ি বের কর।

ড্রাইভার মোতিরাম কুণ্ঠিতভাবে বলে—আজ আর শিকারে না গেলেন হুজুর ; মনে হচ্ছে, আপনার শরীরটা ভাল নয়।

—চুপ। আমি খুব ভাল আছি। চল, খাঁ সাহেবের জমিদারীর সেই জঙ্গলের গাঁয়ে ; কি যেন নামটা ?

—মোরাঙ্গি, হুজুর।

সেখানে খাঁ সাহেবের একটা খামার বাড়িও তো আছে ?

—জী হাঁ, হুজুর।

—বনছাগল আর কাকার হরিণ পাওয়া যায় শুনেছি।

—জী হাঁ, চিতল হরিণও পাওয়া যায়।

—ঠিক হ্যায়। জলদি কর।

কিন্তু সত্যিই তো শিকারের জন্য নয়। অন্তত আজকের এই রাতটা, ভিলা মাধবীর ভয়ানক শূন্যতার কামড়ের ভয় থেকে বুকটাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যেই শিকারে বের হয়ে গেলেন সুজীবন।

মোরাঙ্গি জঙ্গলে খাঁ সাহেবের খামারবাড়ির একটি একচালার নীচে চারপায়ার উপর বসে, সামনের নিরেট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে, শুধু রাতের প্রহরগুলিকে ক্ষয় করে দিতে থাকেন সুজীবন সেন। খামারবাড়ির ভাণ্ডারী এসে বলেছে—এখানে এভাবে একা বসে থাকবেন না সাহেব, এদিকে অনেক খারাপ জানোয়ারও আছে। তা ছাড়া হরিণও শেষরাতের দিকে, প্রায় ভোরের সময়ে এই সব্জীক্ষেতের শাক খেতে আসে। কাজেই, আপনি এখন ভাণ্ডারের একটি ঘরে ···

সুজীবন—ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি, আমি ঠিক আছি।

হাতে ঠাণ্ডা পাইপ, পাশে অলস রাইফেল, সুজীবন সেনের জাগা চোখের সামনে রাতের অন্ধকার ফিকে হতে

হতে ফরসা হয়ে আসে। চোখ দুটো ভোরের আকাশের প্রথম আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেও প্রাণটা যেন একটা স্বপ্নের কাছে বসে থাকে।

ছোট্ট একটা শব্দ ; ভিলা মাধবীর গেট কারও হাতের ঠেলায় খুলে যাবার আগে যেরকম ছোট্ট একটা শব্দ শিউরে দেয়।

চমকে উঠলেন সুজীবন। দেখতেও পেলেন, সামনের মূলো ক্ষেতের উপরে ছুটে বেড়াচ্ছে ছোট্ট একটা কাকার। শব্দটা ওরই ফূর্তির শব্দ।

রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে চারপায়া থেকে উঠে দাঁড়ান সুজীবন। কিন্তু ছোট্ট কাকার হরিণটাকে মারবার জন্যে নয় ; ভিলা মাধবীতে ফিরে যাবার জন্য সুজীবনের রাত-জাগা প্রাণটা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সত্যিই কি এই ভোরে ভিলা মাধবীর গেট খুলে কেউ আবার ভিতরে চলে গেল? তা হলে তো উপদ্রবটা আরও জঘন্য হয়ে উঠবে। চারু রায়ের মেয়েকে সরিয়ে দেবার জন্য শেষে কি পুলিস ডাকতে হবে?

ফিরে এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকেই রাইফেলটাকে বিছানার উপর ফেলে দিলেন সুজীবন।

না, আজকের ভোরের আলো দেখা দিতেই ভিলা মাধবীর গেট খুলে কেউ ভিতরে ঢোকে নি। সেই ছোট্ট শব্দটা একটা কল্পনার মিথ্যে ভয়ের শব্দ। কাল বিকালেও ও-ঘরের মিররের কাছে দাঁড়িয়ে পাউডার সেণ্ট আর হেয়ার ক্রীমের একটা

হাল্‌কা গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। সে-গন্ধ আজ এখন আর নেই।

যত সব বাজে চিন্তার কথা। ওসব আজ আর সুজীবন সেনের জীবনের কোন সমস্যার কথা নয়। জানকীলাল যমুনাদাস এসেছে : এখন ওর সঙ্গে কাজের কথা আলোচনা করতে হবে। ভাল জাতের লাল হেমাটাইটের একটা ফিল্ডের খোঁজ পেতে চায় জানকীলাল। কিন্তু এ জেলাতে তো ও জিনিস পাওয়া যাবে না। রামগড়ের দিকে ভাল বোক্সাইটের খোঁজ দিতে পারেন সুজীবন সেন।

কাজ বেশি, শিকার কম, হুইস্কি আরও কম; সুজীবন সেনের জীবনে সত্যিই যে একটা পরিবর্তনের কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে, এটা তিনি নিজেও বোধ হয় বুঝতে পারেন না। ছটা মাস পার হয়ে যাবার পরেও বুঝতে পারেন না। টাউনের অনেকেই কিন্তু এরই মধ্যে অনেক কিছু জানতে পেরেছে আর লক্ষ্যও করেছে, সেন সাহেবের মুখে আজকাল সেই হাসি থাকলেও বেশ একটা চিন্তার ভাব দেখা যায়।

এলাহাবাদের আদালতের কিছু খবর আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু এরই মধ্যে পেয়ে গিয়েছেন। মামলাতে সেন সাহেবের স্ত্রী নিজেকে ডিফেণ্ড করবার কোন চেষ্টা করেন নি। উনিও সম্পর্ক ছাড়তেই চাইছেন। কাজেই শিগগিরই একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সেন সাহেবের ডিভোর্সের আবেদন মঞ্জুর হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

আর ছটা মাস পার হয়ে যেতেই আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু ছাড়া আরও অনেকেই জেনে ফেললেন, সেন সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে আদালতের রায় বের হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মেয়ের কাস্টডি পাওয়ার জন্যে সেন সাহেবের প্রাক্তনা স্ত্রী আদালতে দরখাস্ত করে ভয়ানক লড়ছেন। সেন সাহেবও ভয়ানক আপত্তি করে লড়ছেন।

একদিন বার লাইব্রেরির ঘরে বসে আদিত্যবাবু নূতন খবরটা সকলকেই শুনিয়ে দিলেন—শুনেছেন তো, সেন

সাহেবই জিতেছেন। মেয়ের মা মেয়ের কাস্টডি পান নি। কিন্তু সেন সাহেব নিজেই এবার একটা গোঁয়ার্তুমির কাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন।

জ্ঞানবাবু—সেটা আবার কি ?

আদিত্যবাবু—মা যেন মেয়েকে চোখে দেখবারও অধিকার না পান; আদালতে দরখাস্ত করে দাবি জানিয়েছেন সেন সাহেব।

জ্ঞানবাবু—এখানে সেন সাহেব সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয় না। মাইনর মেয়ে; তাকে দেখবার অধিকার মায়ের তো থাকবেই; এটা আদালত নাকচ করবে কেন ?

ঠিকই ধারণা করেছিলেন জ্ঞানবাবু। একদিন বার লাইব্রেরির সকলেই খবরটা জানতে পেলেন, মেয়েকে চোখে দেখবার অধিকার পেয়েছেন মাধবীলতা; সুজীবনের আপত্তি নাকচ করে দিয়েছে আদালত।

কিন্তু টাউনের কোন ভদ্রলোক জানেন না, খুব রাগারাগি করে উকিল প্রসাদবাবুকে একটা চিঠিও লিখে ফেলেছেন সুজীবন সেন। আবার আদালতে দরখাস্ত করা হক, মাধবীলতা যেন মেয়ের সঙ্গে কোন ঘরোয়া কথা বলাবলি করবে না বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়। সুজীবন সেনের মেয়ে, দশ বছর বয়সের রঞ্জিতা সেনের কাঁচা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ মাধবীলতা যদি পায়, তবে তার ফলে সুজীবন সেনের পারিবারিক জীবনের শান্তি নষ্ট হতে পারে: মেয়ের জীবনেরও ক্ষতি হতে পারে।

জ্ঞানবাবু একদিন ক্লাব-ঘরে বসে গল্প করতে গিয়ে হেসে

ফেললেন—ওঃ, সেন সাহেব সত্যিই ভয়ানক কড়া মেজাজের মানুষ। এলাহাবাদের আদালতের খবরটা দেখেছেন তো, আদিত্যবাবু ?

আদিত্যবাবু—দেখেছি, মশাই। সেন সাহেবের জেদেরই জিত হয়েছে।

টাউনের লোক কেউই জানতে পারে নি, ঠিক আর তিন মাস পরের একটি দিনে, ওই সিংহানি হোটেলের বারান্দাতে কি রকমের একটি কাণ্ড ঘটে গেল।

সেদিন ভিলা মাধবীর ঝাউয়ের কাণ্ড দেখে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুজীবন সেন। ঝাউগুলি বিনা ঝড়েই উতলা হয়ে দুলছে। সিংহানি হোটেলের মিসেস চৌধুরীর গাড়িটা ভিলা মাধবীর গেটের সামনের রাস্তা দিয়ে ধূলো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল ; ঝাউগুলি কি সেই গাড়ির ভিতরে কোন চেনা মুখকে দেখতে পেয়েছে ?

দুদিন আগে মিসেস চৌধুরী চিঠি লিখে সুজীবনকে জানিয়ে দিয়েছেন, এলাহাবাদ থেকে মাধবী আসছে। সিংহানি হোটেলেই তিনদিন থাকবে মাধবী। আগামী সোম-মঙ্গল-বুধ, এই তিনদিন যেন রঞ্জুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মা ও মেয়ের সাক্ষাৎ হবে।

কাল বিকালেই রাঁচিতে টেলিফোনে বড়দিকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন সুজীবন। কথা হয়েছে, বড়দি নিজেই রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসবেন। আর, মা ও মেয়ের সাক্ষাতের সময় বড়দি সামনেই থাকবেন। রঞ্জুকে শুধু আয়ার সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হবে না। রঞ্জুকে একা একা কাছে পেয়ে

যা খুশি তাই বলে নেবার কোন সুবিধা চারু রায়ের মেয়েকে দেওয়া হবে না।

কিন্তু বড়দি এবার রঞ্জুকে নিয়ে এসে পড়লেই তো হয়। সকাল দশটায় রওনা হলে এরই মধ্যে তো পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল।

ঝাউয়ের শব্দ শুনে শুনে সুজীবন সেনের মনের অস্বস্তিটা এরই মধ্যে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আর তো ভিলা মাধবীর এই ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না সুজীবন। এখান থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ, এখন সিংহানি হোটেলের একটি ঘরে বসে আছে চারু রায়ের মেয়ে; ভাবতে যে গা ঘিন-ঘিন করে। নিশ্বাসে জ্বালা ধরে যায়।

রাঁচি থেকে বড়দির গাড়ি এসে পড়তেই হাঁপ ছাড়েন সুজীবন সেন। এগিয়ে যেয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমো খান। তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেন—মোতিরাম, গাড়ি বের কর।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা? সুজীবনের হাত ধরে ঝুলতে থাকে রঞ্জু। সুজীবন হাসতে চেষ্টা করেন।—বাইরে যাচ্ছি রঞ্জু।

বড়দি বলেন—তোমার এখন বাইরে যাবার কি দরকার হল, জীবু?

সুজীবন—অন্তত তিন-চারটে দিন বাইরে থাকব।

বড়দি—কোন মানে হয় না।

সুজীবন—না বড়দি; আমার খুব খারাপ লাগছে। মানে হক বা না হক।

বড়দি—কিন্তু কোথায় চললে?

সুজীবন—তিনটে দিন ডুমরি ডাক বাংলোতে থাকব।

বড়দি—কিন্তু, বাজে জিনিস বেশি খেও না।

হেসে ফেলেন সুজীবন—না, আজকাল বেশি খাই না। শুধু সন্ধ্যেবেলা সামান্য একটু।

গাড়িতে উঠলেন সুজীবন। দেখতেও পেলেন, সিংহানি হোটেলের বেয়ারা একটি চিঠি নিয়ে ঢুকছে। বড়দিকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য চলন্ত গাড়ি থেকেই মুখ বাড়িয়ে আর একজোড়া জ্বলন্ত চোখ নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সুজীবন—মনে থাকে যেন বড়দি; মেয়েমানুষটার সঙ্গে আর একটিও নরম কথা নয়; কোন আপোষ নয়।

আজ বিকালে সিংহানি হোটেলের বারান্দার দিকে উঁকি দিলে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতেন আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু।

পাশাপাশি দুটি চেয়ারে মাধবীলতা আর তাঁর রেবা মাসিমা। মুখোমুখি আর দুটো পাশাপাশি চেয়ারে সুজীবন সেনের মেয়ে রঞ্জিতা সেন আর তার পিসিমা।

রঞ্জুর মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন মাধবীলতা আর বার-বার চোখ মুছছেন। রঞ্জুর পিসিমা কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে, দুচোখে শুধু কঠোর দুটি ভ্রুকুটি ধরে রেখে এক মনে কাঁটা চালিয়ে উল বুনছেন।

মাধবীলতা বলেন—কেমন আছ রঞ্জু?

সঙ্গে সঙ্গে বড়দির গলা থেকে যেন একটা রুষ্ট আপত্তির

স্বর ফেটে পড়ে। —একথা জিজ্ঞেস করবার কোন দরকার নেই।

রেবা মাসিমা মৃদুভাবে হেসে বড়দিকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। —এ তো সামান্য একটা কথা। এর জন্যে আপনি রাগ করছেন কেন ?

বড়দি—মেয়ে বাপের কাছে আছে ; ভালই আছে, সেটা তো জানা কথা। জিজ্ঞাসা করবার কোন মানে হয় না।

মাধবীলতা—আজকাল কি বই পড়ছ, রঞ্জু ?

রঞ্জু—নেলসন্‌স্ রীডার, সেকেণ্ড পার্ট।

মাধবীলতা হাসেন—বেশ। খুব মন দিয়ে পড়বে। কিন্তু ··· কিন্তু আমার কাছে এস একবার।

রঞ্জু একটা লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে মাধবীলতার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। মাধবীলতা বলেন—এতক্ষণ চুপ করে বসে রইলে কেন ? কেউ কি আমার কাছে আসতে মানা করে দিয়েছে ?

বড়দি চোখ তুলে রেবা মাসিমার দিকে কটমট করে তাকান—শুনছেন মিসেস চৌধুরী ? এ-রকমের অসভ্য প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার বোনঝির নেই।

রেবা মাসিমা আবার হাসতে চেষ্টা করেন। —ওটা একটা দুঃখের প্রশ্ন মাত্র। আপনি কিছু মনে করবেন না।

বড়দি—আমি শুধু চাই যে, ভাল-মন্দ কোন রকমের ঘরোয়া কথা হবে না। তাহলেই কিছু মনে করব না।

মাধবীলতা—বড়দি মিছিমিছি রাগ করছেন কেন ?

বড়দি—তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না ; আমি তোমার বড়দি নই।

মাধবীলতার মুখের হাসিটা হঠাৎ যেন আগুনের ফুল্‌কি হয়ে ঠিকরে পড়ে। —আপনিও আমাকে ধমক দিয়ে আর তুমি করে কথা বলবেন না। আপনি আমার ননদ নন।

বড়দির চোখ ছুটো যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে আর সাদা হয়ে যায়। তার পরেই ভিজে গিয়ে চিকচিক করতে থাকে। একেবারে নীরব হয়ে আর মাথা হেঁট করে আবার একমনে ছুহাতে উলের কাঁটা চালাতে থাকেন বড়দি।

রঞ্জু হঠাৎ মাধবীলতার গায়ে আতুরে ভঙ্গিতে একটা ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: —তুমি কবে আসবে?

মাধবীলতা হাতের রুমালটাকে মুখের কাছে তুলে ধরেন, কোন কথা বলেন না।

রঞ্জু—তুমি কোথায় থাক?

মাধবীলতা মুখ ঘুরিয়ে দরজার রামধনু রঙের পর্দাটার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রঞ্জু—বাবার খুব খারাপ লাগছে। ডুমির ডাক বাংলোতে চলে গেল বাবা।

মাধবীলতা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়ে আর বারান্দার কার্পেটের উপর থেকে একটা বল কুড়িয়ে নিয়ে লনের দিকে ছুঁড়ে দেন। কোথা থেকে একটা স্প্যানিয়েল ছুটে এসে বলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রঞ্জু বলে—বাবা আজকাল বাজে জিনিস বেশি খায় না। শুধু সন্ধ্যেবেলা একটু।

বারান্দা থেকে নেমে স্প্যানিয়েলটাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকেন মাধবীলতা।

রঞ্জু রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।—চল পিসি, মা ভয়ানক দুষ্টু, আমার সঙ্গে কথাই বলছে না।

ছুটে আসেন মাধবীলতা। রঞ্জুকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরেন, রঞ্জুর মাথার উপর গাল পেতে দিয়ে আর চোখ বন্ধ করে একেবারে নিঃস্পন্দ হয়ে কিছুক্ষণের জন্য যেন ঘুমিয়ে পড়েন মাধবীলতা। তারপরই রঞ্জুকে ছেড়ে দিয়ে আর চোখ মেলে কথা বলেন।—এস রঞ্জু।

বড়দি এইবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। রেবা মাসিমার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—রঞ্জু এবার কার্সিয়ং কনভেণ্টে থাকবে। বছরে শুধু তিনটে মাস, ডিসেম্বর জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি এখানে এসে বাপের কাছে থাকবে। কাজেই, আপনার বোনঝি যদি রঞ্জুকে দেখতে ইচ্ছে করেন, তবে এই তিনটে মাসের মধ্যে কোন সময়ে যেন দেখে যান। যখন তখন এলে দেখা হবে না।

রঞ্জুর হাত ধরে সিংহানি হোটেলের গেট পার হয়ে সড়কের উপরে দাঁড়ালেন আর হাঁপ ছাড়লেন বড়দি। রঞ্জু বলে—মা তাকিয়ে আছে পিসি।

বড়দি কোন দিকে না তাকিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—চল, রঞ্জু।

মাত্র দশ মিনিটের পথ, বড়দির আর রঞ্জুর আস্তে আস্তে হেঁটে আসতে বড় জোর পনর মিনিট হয়েছে। ভিলা মাধবীর বারান্দায় এসে উঠতেই শুনতে পেলেন বড়দি, টেলিফোন বেজেই চলেছে।

—হ্যালো, কে ? প্রশ্ন করেন বড়দি।

সিংহানি হোটেল থেকে মাধবীলতার রেবা মাসিমা বললেন—মাধু এখনই এলাহাবাদ ফিরে যাচ্ছে। কাজেই, বুঝতে পারছেন, কাল আর রঞ্জুকে এখানে নিয়ে আসবার দরকার নেই।

ভিলা মাধবীর ঝাউ আর উতলা হয়ে মাথা দোলায় না, যদিও সামনের সড়ক দিয়ে মাধবীলতাকে নিয়ে সিংহানি হোটেলের গাড়িটা ছুটে চলে গেল।

আর, মিনিট পনের পরে সিংহানি হোটেলের বেয়ারা একটি চিঠি ও একটি জিনিস হাতে নিয়ে ভিলা মাধবীর কাছে এসে বড়দিকে সেলাম জানাল।

মাধবীলতার রেবা মাসিমা লিখেছেন—মাধু এই আংটিটা আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে বলে গেল। কাজেই পাঠালাম।

আংটিটাকে হাতে তুলে নিতেই বড়দির হাতটা কেঁপে ওঠে। যেন একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো হাতে তুলে নিয়েছেন।

বিধবা মানুষ বড়দি। বড়দির স্বামী, নাগপুরের ব্যারিস্টার এস দত্ত আজ পাঁচ বছর হল মারা গিয়েছেন। হঠাৎ একটা কঠিন অসুখে পড়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এস দত্ত। বড়দি প্রায় পুরো ষোলটি বছর মেয়ে-কলেজে পড়িয়েছেন, সংসারের খরচ চালিয়েছেন, আর একমাত্র ছেলে দশ বছর বয়সের মণ্টুকে বড় করে তুলেছেন। তার উপর অন্ধ স্বামীকে নিজের হাতে স্নান করিয়ে আর খাইয়ে দিতে হয়েছে। মণ্টু আজ রেলওয়ের অফিসার হয়ে রাঁচিতে আছে। মণ্টুর বউও

আছে। বড়দির একটি নাতিও আছে। এমন বড়দি মাধবী-লতার ফেরত পাঠানো আংটিকে ভয়ানক একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো বলে না মনে করে পারবেন কেন?

আংটিটাকে সুজীবনের বইয়ের আলমারির এক কোণে গুঁজে রেখে দিয়ে বড়দি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন।

রঞ্জু এখন খাবে। খাবার টেবিলের কাছে রঞ্জুর পাশে বসে থাকেন বড়দি; তারপর রঞ্জুকে শোবার ঘরের বিছানায় তুলে দিয়ে আবার বাইরের ঘরে এসে বসে থাকেন। রঞ্জুর আয়া বুড়িটা এখনও আছে; কিন্তু আর কতদিন বেঁচে থাকবে? অথচ এই মেয়েটার জীবনটা যে পড়েই রইল। দুটো মায়ার কথা বলে আর আদর করে ওর হাতে দুধের গেলাসটা তুলে দেবার মত একটা মানুষও যে এ-বাড়িতে থাকবে না। বড়দি নিজে বার বার রাঁচি থেকে এসে কত-টুকুই বা করতে পারবেন? তাঁকেও তো একটা দুষ্টু নাতির সব দুরন্তপনার দায় সামলাতে হয়।

জীবু অবশ্য হেসে-হেসে বলেছে, ছুটিতে কনভেণ্ট থেকে এসে রঞ্জু যে তিনমাস এখানে থাকবে, সে তিনমাস বড়দি যেন রাঁচির সংসার থেকে প্রিভিলেজ লীভ নিয়ে এখানে এসে থাকেন। কিন্তু ষাট বছর বয়সের মানুষ বড়দির পক্ষে আর কটা বছরই বা ও-ভাবে এখানে বার-বার আসা আর থাকা সম্ভব হবে?

জীবুর মনটাও তো এখন খালি হয়ে গিয়েছে। মিথ্যে বোঝার ভার নামিয়ে আর সরিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে গিয়েছে। এখন এই একলা জীবনের শূন্যতাকে ইচ্ছা করলেই তো একজন

সঙ্গিনীর ভালবাসা দিয়ে ভরে ফেলতে পারে জীবু। রঞ্জু মেয়েটাও তাহলে অন্তত চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে আবোল-তাবোল কথা বলবার মত একটা মানুষকে পেয়ে যাবে। ভালই হবে। আবার বিয়ে করতে আপত্তি হবে কেন জীবুর ?

পাশের ঘরের পর্দাটা হাওয়া লেগে দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বড়দির চোখ দুটো যেন ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। পাশের ঘরের মেঝের এককোণে একজোড়া ভেলভেটের চটি। চরু রায়ের মেয়ে মাধবী যেন এখনও ওই ঘরের ভিতরে আছে।

এ-ঘর আর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে দেখলেন বড়দি ; বার বার চমকে উঠলেন বড়দি ; আর চোখ দুটো আরও ভয় পেয়ে সাদা হয়ে যেতে থাকে।

কে বলবে, ভিলা মাধবীর মাধবী নেই ? বড়দির ভাই এ কী ভয়ানক মাতলামির কাণ্ড করে রেখেছে ! মাধবীলতার সব জিনিস যেখানে যেমন ছিল, সেখানেই তেমনই পড়ে আছে। কোন জিনিসকে এখনও সরিয়ে ফেলা হয় নি। মিররের হুকে যে তোয়ালেটা ঝুলছে, সেটা যে মাধবীরই মুখের ক্রীম-মোছা তোয়ালে। আলমারির তাক ভর্তি হয়ে মাধবীর শাড়িগুলি এক-একটা রঙীন সমাদরের মত সাজানো রয়েছে। বাথ্‌রুমের কাচের তাকের উপরে মাধবীর হেয়ার অয়েলের শিশিটার ছিপি খোলা। সুজীবনের পাথরের মিউজিয়ামের ঘরের দেয়ালে মাধবীর অয়েল পোট্রেটও হাসছে। শীতের দিনে মাধবীলতা গলায় জড়াতো যে ফার, সেটাও একটা চেয়ারের উপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বড়দির ভয় আর বিস্ময় কান্না হয়ে ফেটে পড়ে। এখনও এইসব ভয়ঙ্কর জঞ্জালকে কেন পুষে রেখেছে সুজীবন? আজকাল তো খুব কমই মদ খায় সুজীবন; তবে বেহুঁস হয়ে এমন করে একটা মিথ্যের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে আছে কেন?

যেদিন ডুমরি ডাক বাংলোর প্রবাস থেকে ভিলা মাধবীতে ফিরে এলেন সুজীবন, সেদিনই বেশি দেরি না করে, আর, গলার স্বর বেশ কঠোর করে নিয়ে কথাটা বলেই দিলেন বড়দি—আংটি ফেরত পাঠিয়েছে।

হেসে ফেলেন সুজীবন সেন—বেশ করেছে। রাক্ষুসীর বুদ্ধি আছে।

বড়দি—তুমিও ওর সব জিনিস ফেরত পাঠিয়ে দাও।

চেঁচিয়ে ওঠেন সুজীবন—ফেরত নয়; ওর সব জিনিস আমি এখনই বোনফায়ার করে ছাই করে দেব।

বড়দি—তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাক। আমিই ব্যবস্থা করছি।

মালীকে আর বেয়ারাকে ডাক দিয়ে চারু রায়ের মেয়ের সব জিনিস, সেই সঙ্গে ওই অয়েল পোর্ট্রেটকেও এক সঙ্গে বাঁধা-ছাঁদা করে সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন বড়দি।

কিন্তু দেখে চমকে উঠলেন বড়দি, হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়েই বড়দির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর ভাই সুজীবন। কটকটে লাল চোখ ছলছল করছে; চেঁচিয়ে হাসছেন সুজীবন।—খুব ভাল হল বড়দি; তুমি ছিলে বলেই কাজটা

এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আমি তো ঘেন্নায় ওসব জিনিস ছুঁতেও পারতাম না।

বড়দি বলেন—যখন-তখন এসব খেও না জীবু। গেলাস রেখে দাও।

সুজীবন—রঞ্জুকে দেখে চারু রায়ের মেয়ে কি বললেন? বাজে কথা বলতে সাহস করে নি তো?

বড়দি—না।

সুজীবন—তুমি কি বললে?

বড়দি—আমাকে বিশেষ কিছু বলতে হয় নি। রঞ্জু যা বলে দিয়েছে, তাই যথেষ্ট। শিক্ষা পেয়ে গিয়েছে। মেয়েকে আরও কদিন দেখবার সাধ ছেড়ে দিয়ে চলেও গিয়েছে।

সুজীবন—আমি এই তো চাইছিলাম বড়দি; রঞ্জু যেন ওকে ভাল করে চাব্‌কে দেয়।

বড়দি আর কোন কথা বলেন না; কিন্তু সুজীবন সেন যেন কৃতার্থ, প্রতিশোধের তৃপ্তিতে বিহ্বল হয়ে বলতে থাকেন—আমি চাই, রঞ্জু চিরকাল ওর ওই মাতাটিকে মনে প্রাণে ঘেন্না করবে।

বড়দি—খেতে চল, জীবু।

সুজীবন—আমাকেও খুব সাবধান থাকতে হবে বড়দি, চারু রায়ের মেয়ের নোংরা জীবনের কোন ছায়াও যেন আমার মেয়ের জীবনে ঘেঁষতে না পারে।

বড়দি—ভগবান রক্ষে করবেন; তুমি একটুও চিন্তা করবে না।

পাঁচদিন পর ভিলা মাধবীর লনের ঘাসের সব ধুলো যেদিন বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেল, সেদিন রঞ্জুকে কার্সিয়ংয়ের কনভেণ্টে রেখে আসবার জন্য রঞ্জুকে নিয়ে রওনা হলেন বড়দি। সঙ্গে গেল বেয়ারা শুকদেও। সেদিন সারা সকালটা রঞ্জুর হাত ধরে বসে রইলেন সুজীবন সেন।

রঞ্জু বলে—তোমাকে অনেক চিঠি লিখব, বাবা।

সুজীবন—নিশ্চয়, যখনই ইচ্ছা হবে, লিখবে। এস সেন, জিওলজিস্ট, ভিলা মাধরী, সিংহানি, হাজারিবাগ।…ও, নো নো, ভিলা মাধবী। কখ্খনো না। শুধু সিংহানি, হাজারিবাগ।

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন সুজীবন, গেটের কাছে এগিয়ে গেলেন, মালীকে ডাক দিলেন।

তিন পোঁচ আলকাতরা মাখিয়ে থামের গায়ে সাদা পাথরের উপর লেখা নামটা ঢেকে কালো করে দিলেন সুজীবন। আইভিলতার শুঁড়গুলিকে টানাটানি করে নামিয়ে দিয়ে মালীটা আবার সেই নামহীন কালিমাকেও ভাল করে ঢেকে দিল।

শুধু কাজ, অনেক কাজ, নানাদিকে ঘুরে-ফিরে কাজ করেছেন সুজীবন সেন। করনপুরার কয়লা, খেলারির লাইম-স্টোন, গাঁওয়ার অভ্র আর গুমিয়ার ফায়ার-ক্লে তাঁকে ডেকেছে। প্রসপেক্টরের সঙ্গে মোটা টাকার ফি চুক্তি করে নিয়ে নতুন খাদ আর খাদানের খোঁজ দিয়েছেন। পাহাড়ের গায়ে ক্যাম্প করে থেকেছেন আর ভুট্টার খিচুড়ি খেয়ে দিন পার করে দিয়েছেন। শিকার করা যেন ভুলেই গিয়েছেন, আর হুইস্কির জন্যও কোন ছটফটানি নেই।

কার্সিয়ংয়ের কনভেণ্ট থেকে রঞ্জু এসেছে। রঞ্জু এসেছে খবর পেয়ে আয়া বুড়িও এসেছে। কাজেই এই তিনটে মাস সুজীবন কোন কাজের তাগিদে বাইরে আর যাবেন না।

বড়দি গল্প করেন।—রাঁচিতে কত মেয়ের সঙ্গেই তো আমার চেনা-শোনা হল, কিন্তু শম্ভুবাবুর ভাইঝি কাবেরীর মত কেউ নয়। কাবেরীর সঙ্গে কারও তুলনা চলে না।

সুজীবন রঞ্জুর হাত ধরে বসে থাকেন আর পাইপ টানেন। বড়দির গল্প শুনে হাসতেও থাকেন।

বড়দি বলেন—খুব শিক্ষিতা মেয়ে তো বটেই ; তা ছাড়া কী চমৎকার স্বভাব। দেখতেও বেশ সুন্দর। সব চেয়ে ভাল ওর হাসিটি। জুঁইফুলের মত শান্ত মিষ্টি আর মিহি একটি হাসি সব সময় মুখে লেগেই থাকে। কলকাতার যে মেয়ে-স্কুলে টিচার হয়ে ঢুকেছিল, এ-বছর সেই স্কুলেরই

হেড-মিসট্রেস হবে কাবেরী। কিন্তু শম্ভুবাবু তাঁর ভাইঝিকে আর চাকরি করতে দিতে রাজি নন।

সুজীবন—মণ্টুর সার্ভিসের খবর কি? প্রমোশন পেল?

বড়দি—পেয়েছে। শম্ভুবাবু আমাকে বলেছেন, আমি যদি কাউকে পছন্দ করে দিই, তবে তিনি খুশি হয়ে তারই সঙ্গে কাবেরীর বিয়ে দেবেন।

সুজীবন—মণ্টুর ছেলেটা রাস্তার লোকের গায়ে ঢিল মারবার অভ্যেস আজকাল বন্ধ করেছে? না, সেইরকমই চালিয়ে যাচ্ছে?

বড়দি—কাবেরীর মনটাকেও আমি যেটুকু চিনতে পেরেছি তাতে অন্তত এটুকু বুঝেছি যে, এ মেয়ে যারই কাছে থাকুক, তাকে শান্তি দিতে আর সুখী করতে পারবে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন সুজীবন।—বড়দি, নেড়া একবারই বেলতলায় গিয়েছিল। কিন্তু আর যাবে না।

বড়দি—এ তোমার মিথ্যে ভয় জীবু।

সুজীবন—না বড়দি, এসব কথা ছেড়ে দাও।

বড়দির সঙ্গে গল্প করে আর রঞ্জুকে আদর করে সুজীবনের একটির পর একটি দিন পার হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু দিনগুলির যে আরও একটা কাজ ছিল। চারু রায়ের মেয়ে তার মেয়েকে দেখতে আসবে। বড়দি রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে সিংহানি হোটেলের বারান্দাতে কিছুক্ষণ বসে থাকবেন। কিন্তু কই, সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমার চিঠি নিয়ে কোন বেয়ারা আর চাপরাশী তো রঞ্জুকে আজও ডাকতে এল না? রঞ্জুর

কনভেণ্টের ছুটির তিন মাসের শেষে কটা দিন তো শিগগিরই ফুরিয়ে যাবে ; আবার কার্সিয়ং চলে যাবে রঞ্জু।

মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে গিয়েছেন সুজীবন। ভাবতে একটু আশ্চর্যও লেগেছে। আদালতের কাছে ধর্ণা দিয়ে, মুখার্জীবাবুর মত উকিলকে লাগিয়ে, ছমাস ধরে দাবির লড়াই চালিয়ে আর আইনের জোরে মেয়েকে চোখে দেখবার যে অধিকার পেয়েছে চারু রায়ের মেয়ে, সেটা যে একটা নেকড়েনীর রক্তমাংসের সাংঘাতিক জেদ, গুলি খেয়েও বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে চায় না।

সুজীবন সেন বোধ হয় বিনা হুইস্কিতেই একটা অদ্ভুত নেশা জমিয়ে প্রাণের গোপনে পুষে রেখেছেন। চারু রায়ের মেয়ে যেন চিরকাল এভাবে বছরের কয়েকটি দিন সুজীবনের জীবনের নীড় থেকে সামান্য একটু দূরে এক হোটেলের বারান্দায় এসে ঠাঁই নেবে আর সুজীবনের মেয়ে রঞ্জুকে আদর করে চলে যাবে। ভিলা মাধবীর ঝাউ দুলে উঠবে, আর চারু রায়ের মেয়েকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য সামনের সড়ক দিয়ে রেবা মাসিমার গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে চলে যাবে। বসে বসে শুধু দেখবেন আর হাসবেন সুজীবন ; কী অদ্ভুত ধুলো।

বড়দি তো আগেই একবার সন্দেহ করেছিলেন, জীবু যেন এখনও একটা নেশার ভুলে আইনের অগোচরে একটা রাখীর সুতো দিয়ে চারু রায়ের মেয়ের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মিথ্যা সম্পর্কের মোহটাকেই বেঁধে রেখেছে। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার দেড় বছর পরেও মাধবীলতার অয়েল পোর্ট্রেট

সরিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিল এই জীবু। তাই জীবুর আনমনা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে বড়দি আজও আবার সন্দেহ করছেন, জীবু কি সত্যই জানে না? এখনও জীবু কি শোনে নি যে, রঞ্জুকে দেখতে আর আর আসবে না চারু রায়ের মেয়ে।

বড়দি বলেন—রঞ্জুকে নিয়ে আমি রাঁচি চলে যাই। ওখান থেকেই রঞ্জুকে কার্সিয়ং পাঠিয়ে দেব। কেমন?

সুজীবন—তা দিও কিন্তু মা আর মেয়ের বাৎসরিক ইণ্টারভিউয়ের কি হল?

বড়দি—সেটা আর কোনদিনও হবে বলে মনে হয় না।

—কেন?

—মাতৃদেবীর এখন বোধ হয় আর কন্যাকে দেখবার জন্যে কোন চাড় নেই, কিংবা ফুরসতই নেই।

—কেন?

—চারু রায়ের মেয়ে তো আবার বিয়ে করেছেন।

—কি বললে?

—হ্যাঁ, সেই পবিতোষ রায়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। ওরা এখন বাঙ্গালোরে আছে। এলাহাবাদ থেকে মণ্টুর শ্বশুর সব কথাই আমাকে লিখে জানিয়েছেন।

—কথাটা তুমি এতদিন আমাকে জানাও নি কেন, বড়দি?

—আমি মনে করেছিলাম, তুমিও নিশ্চয় খবরটা জেনেছ।

—না, জানতে পাই নি। যাক খুব ভাল হল, বড়দি।

বেশ শান্তভাবে হেসে পাইপ ধরালেন সুজীবন। আর বেশ শান্তভাবেই আস্তে আস্তে হেঁটে লনের চারিদিকে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

অনেকক্ষণ পরে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন বড়দি। ঘরের ভিতরে যেন একটা কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে ঝনঝনিয়ে ভেঙ্গে গেল।

এগিয়ে যেয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে বড়দি বেশ একটু বিরক্তভরা স্বরে কথা বলেন—আবার এসব কেন শুরু করলে, জীবু? ছিঃ।

সুজীবনের কটকটে লাল চোখ হাসতে থাকে।—এবার তো প্রমাণ পেয়ে গেলে বড়দি, চারু রায়ের মেয়ের চোখে রঞ্জুও একটা জঞ্জাল। ওটা তা হলে নেকড়েনীর চেয়েও ইতর একটা প্রাণী।

বড়দি—চুপ কর। আমরা এখন রওনা হব।

সুজীবন—হ্যাঁ যাও। কিন্তু রঞ্জুকে বেশ স্পষ্ট করে বলে বুঝিয়ে দিও, ওর মা ওকে একটা অচেনা কুকুরের বাচ্চা বলে মনে করে।

বড়দি—চুপ কর। কথা বলো না। সুজীবনের হাতের কাছের ছোট টেবিল থেকে হুইস্কির বোতলটা সরিয়ে নিয়ে আলমারিতে বন্ধ করেন বড়দি।

গাড়ি বের করে তৈরি হয়েছে ড্রাইভার মোতিরাম। রঞ্জুর কপালে এক মিনিট ধরে মুখ ঠেকিয়ে চুমো খেলেন সুজীবন। রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন বড়দি।

ঝড়ের হাওয়াতে শনশন করছে ভিলা মাধবীর ঝাউ। আর, সুজীবন সেন নিজেও যেন একটা ছটফটে অস্থিরতার

ঝড় হয়ে ভিলা মাধবীর এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াতে থাকেন। ইউকালিপটাসের ছায়াতে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরান। হাত থেকে ফসকে গিয়ে পাইপটা ঘাসের উপর পড়ে যায়। তুলে নিয়েই আবার বাগানের নিরালাতে একটা বুড়ো দেবদারুর ছায়াতে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন।

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। তবু ভিলা মাধবীর ঝাউয়ের শনশনে শব্দের মাতলামি থামতে চাইছে না।

ঘরে ঢুকলেন সুজীবন। লেখার টেবিলের কাছে বসলেন। তারপর দেরাজের হাতলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে দেরাজটাকে টানলেন। রঙীন নক্সা-করা চামড়ার একটা ব্যাগ বের করলেন।

শূন্য ব্যাগ। চুপসে রয়েছে ব্যাগটা। মাধবীলতার লেখা, সেই দুর্বার ভালবাসার একান্নটা চিঠির একটিও চিঠি নেই। সুজীবন সেনের গোপন জাদুঘর একেবারে খালি হয়ে পড়ে আছে।

কেউ যেন সুজীবনের জীবনের গুপ্তধন চুরি করে নিয়ে সরে পড়েছে। সুজীবনের চোখ দুটো যেন একটা নীরব হাহাকার নিয়ে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে সেই শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভালই করেছেন চারু রায়ের অতিচালাক আর অতি-সাবধান মেয়ে। একান্নটা মিথ্যের দলিলকে একদিন সময় বুঝে সরিয়ে নিয়ে আর ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে বোধ হয় কিচেনের জ্বলন্ত উনুনের ভিতরে ফেলে দিয়েছেন। খানসামা স্টিফান তখন বোধ হয় কিচেনে ছিল না, ভাল টমেটো কিনতে গাঁয়ের হাটে গিয়েছিল।

চোখে নয়, বুকেরই ভিতরে একটা জ্বালা কটকট করছে। এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে যে নিজেই ইচ্ছে করে সুজীবন সেনকে ভালবেসেছিল আর বিয়ে করেছিল, সে-কথা বলে দেবার মত একটা সামান্য লেখার চিহ্নও আর পৃথিবীতে রইল না।

হেসে ফেলেন সুজীবন। মিররের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান, হাসিটা যেন কুৎসিত একটা কাঁদুনে হাসির মত কাঁপছে।

চারশো বোরের কর্ডাইট রাইফেল সামনের সোফাটারই উপর পড়ে রয়েছে। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে আর নিথর হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন সুজীবন সেন। তারপরেই টেলিফোন করে চাতরার এস ডি ও'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন আর খবর শুনে খুশিও হলেন, এই সীজনেও চাতরার জঙ্গলে একদল নীলগাই এসেছে।

রাঁচি থেকে গাড়িটা ফিরে আসতেই ডাক দিলেন সুজীবন।—মোতিরাম, এক্সকিউজ মি, তুমি তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নাও। এখনই শিকারে বের হব।

জঙ্গলের পাশে একটা গাঁয়ের একটা খড়ের মাচান। মাঝরাতে চাঁদ উঠেছে আর জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে সামনের অড়হরের ক্ষেত। রাইফেলটাকে কোলের উপর তুলে চুপ করে বসে থাকেন সুজীবন।

ঘুমিয়ে পড়েন নি, স্বপ্নও দেখেন নি সুজীবন। কিন্তু এ যে

অদ্ভুত একটা আশার স্বপ্নময় ছবি। একটা নীলগাই খড়ের মাচান থেকে দশ হাত দূরে আস্তে-আস্তে ঘুরে-ফিরে কচি অড়হর ভাঙছে ছিঁড়ছে আর খাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিকিয়ে উঠছে প্রাণীটার চোখ দুটো; তাই ঠিক কপালের মাঝখানে তাক করতে কোন অসুবিধেও নেই। ভালই হবে; এক গুলিতে কপালটাকে ফুটো করে দিলেই চলবে। বেশ নিখুঁত ও আস্ত একটা ছাল পাওয়া যাবে; কোন ফুটো-ফাটা থাকবে না। কলকাতার ট্যাক্সিডার্মিস্ট খান্নার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছালটাকে ভাল করে প্রসেস করিয়ে নিতে হবে। তারপর ওটাকে ড্রইংরুমের পর্দা করে ঝুলিয়ে রাখলে আরও চমৎকার দেখাবে।

কিন্তু দূরে ওটা আবার কে? কি আশ্চর্য, আরও একটা নীলগাই একেবারে নিশ্চল হয়ে, গলা উঁচু করে আর মুখ তুলে এই নীলগাইটার দিকে যেন ভয়ানক সতর্ক একটা প্রেমের পাহারা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। উনি বোধ হয় সঙ্গিনী আর ইনি হলেন সঙ্গী।

রাইফেলটাকে কোলের উপর থেকে তুলে নিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখেন সুজীবন। ফ্লাস্কের ছিপি খুলে হুইস্কি মেশানো ঠাণ্ডা বীয়ারের ছোট্ট একটি ঝর্ণাকে গলগল করে গিলে নিয়ে ঢেঁকুর তোলেন। তারপর হেসে ফেলেন। নাঃ, বড়দি এখন কাছে থাকলে আরও জোরে হেসে আর তামাশা করে বলে দিতে পারা যেত, ওদিকের ওটা হল চারু রায়ের মেয়ে, আর এদিকের এটা হল বেচারা পরিতোষ। এটাকে গুলি করে মারবার কোন মানে হয় না।

চেষ্টা করলে ওটাকে অবশ্য এক গুলিতে সাবড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দরকার কি ? হাত নোংরা করে লাভ নেই।

মাচান থেকে নেমে আর আস্তে-আস্তে হেঁটে আবার গাঁয়ের মাহাতোর বাড়ির কাছে ফিরে এসে গাড়ির বনেটের উপর আস্তে একটা চাপড় মেরে ড্রাইভার মোতিরামের ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন সুজীবন।—চল, মোতিরাম।

ভিলা মাধবীর মাধবী নেই। আলকাতরার কালো দিয়ে পুরু করে ঢাকা পাথরের ফলকটার নামহীন চেহারার উপর আরও একটা আবরণ হয়ে আইভিলতার শুঁড়গুলি আরও ঘন হয়ে তুলছে। তবু লোকে বলে, ভিলা মাধবী।

সুজীবন সেনের জীবনে আর কাজ নেই, শুধু আছে হুইস্কি। এক-একটা নতুন বছর আসছে আর ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুজীবন বোধ হয় মনে করেন, কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না। আর কী আছে যে ফুরিয়ে যাবে?

জানকীলাল যমুনাদাস কতবার এসেছেন আর কত সাধাসাধি করেছেন; কিন্তু আর কোন কাজের দায় নিতে রাজি হন নি সুজীবন। ইচ্ছে করলে একদিনের জন্য ওদারনা ভ্যালিতে গিয়ে ভাল সালফাইটের খোঁজ দিতে পারতেন, কিন্তু তাও দেন নি।

হ্যাঁ, শুধু বছরের তিনটে মাস রঞ্জু যখন কনভেণ্ট থেকে এসে এখানে থাকে, তখন সুজীবন সেনের হুইস্কির বোতল একটু আড়াল হয়ে লুকিয়ে থাকে। আর, সকালবেলা একবার ঘণ্টা দু তিনের মত সেণ্ট কলাম্বাস কলেজের সামনের বিরাট ময়দানে গল্‌ফ্ খেলে একটু বেড়িয়েও আসেন।

কিন্তু ভিলা মাধবীর লন আর বাগানকে রঙীন করে রেখেছে মালী চমনরাম। ঘর বারান্দা শার্সি কার্পেট আর

আসবাব, সবই ঝকঝকে আর তকতকে করে রেখেছে বেয়ারা শুকদেও।

বড়দির সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে বেশ বিরক্ত হয়ে কয়েকবার চেঁচিয়ে উঠেছেন সুজীবন—এ এক আপদ হয়েছে, বড়দি। এখনও যে-সব চিঠি আসে, তাতে ঠিকানার সঙ্গে বাড়িটার সেই বাজে নামটাও থাকে।

বড়দি হেসে ফেলেন—ওতে কি এসে যায়? তুমিই বা এটা থামাতে পারবে কেমন করে?

টাউনের লোকে এখনও বলে ভিলা মাধবী। সত্যিই তো, এ আপদ কি করে ঠেকাতে পারবেন সুজীবন? মনে-প্রাণে জীবনে ও আইনে যেটা একেবারে নিছক মিথ্যা, সেটা যেন একটা বাতাসের অদেখা চক্রান্তে চিরকালের কথা হয়ে থেকে যাচ্ছে। এই একটা অস্বস্তি; একটা বিশ্রী বাজে ঠাট্টার ঠোকর। এছাড়া সুজীবনের জীবনে কোন অস্বস্তি আর নেই।

টাউনের লোক দেখতে পায়, সেন সাহেব একটু বুড়িয়ে গিয়েছেন। মাথার দুপাশে কানের কাছের সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। তবু বেশ শক্ত আছেন। গল্‌ফ্‌ খেলতে বের হয়ে ময়দানের ঘাসের উপর কী সুন্দর স্টান্সে দাঁড়িয়ে আর ক্লাব তুলে ড্রাইভ দিতে পারেন সেনসাহেব। বল যেন হাউইয়ের মত শিস দিয়ে উড়ে চলে যায়।

কলেজের সায়েন্সের ছাত্র ছেলেরা এখনও মাঝে মাঝে, বছরে অন্তত একটিবার সেনসাহেবের পাথরের মিউজিয়াম দেখতে আসে। কিন্তু সেনসাহেব নিজে আর ব্যস্ত হয়ে

ছেলেদের কাছে পাথরের রোমান্সের কোন গল্প বলেন না। শুধু বেয়ারা শুকদেও এসে মিউজিয়াম ঘরের দরজা খুলে দেয়। ছেলেরা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শুধু শুকদেও দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু সেনসাহেবের সেই সৌজন্যের পুরনো হাসিটা এখনও আছে। ছেলেরা চলে যাচ্ছে দেখতে পেয়েই এগিয়ে আসেন, আর হাসিমুখে অনুরোধও করেন—আরও কিছুক্ষণ থাক। চা খেয়ে যাও।...স্টিফান, কোথায় তুমি? এদের চা খাইয়ে দাও।

ছেলেরা লনের উপর শুয়ে বসে আর গড়িয়ে অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না স্টিফান খানসামা চা নিয়ে আসে।

ছেলেরাও বলাবলি করে—সেনসাহেবকে দেখলে কিন্তু স্কলার বলে মনে হয় না। একজন রিটায়ার্ড মিলিটারী জেনারেল বলে মনে হয়। এত বয়স হয়েছে; তবু কত স্মার্ট।

কথাটা খুব ভুল বলে নি কলেজের সায়েন্সের ছেলেরা। শুধু রিটায়ার্ড নয়, বেশ টায়ার্ড জীবনও বটে। যেন লড়াই করবার আর কিছু নেই। আর, যেটুকু লড়াই করা হয়েছে তাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সুজীবন। বছরে যে কটা দিন রঞ্জু থাকে, শুধু সেই কটা দিন একটু বেশি নড়া-চড়া করেন; একটু ছুটোছুটিও করে ফেলেন। কিন্তু তারপর আর কিছু করবার থাকে না। বারান্দায় আর লনে একটি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকেন আর পাইপ টানেন।

অবশ্য এক-আধবার উঠে গিয়ে ঘরের ভিতরেও যান; আর মুখের রঙ লালচে করে আবার ফিরে আসেন। কিন্তু

বড়দি স্টিফানকে আড়ালে ডেকে নিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই হুইস্কির বোতলে জল মিশিয়ে রাখে স্টিফান। তা না হলে সুজীবন সেনের চোখ-দুটো আরও লাল হয়ে উঠত।

রঞ্জুর আয়া-বুড়ি গত বছর মরে গিয়েছে। আয়া-বুড়িকে দেখতে না পেয়ে খুব কেঁদেছিল রঞ্জু। ড্রাইভার মোতিরামের মাথায় টাক পড়েছে। খানসামা স্টিফানের একটা পায়ে বাতে ধরেছে; আজকাল একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে স্টিফান। বেয়ারা শুকদেও সব দাঁত তুলে ফেলেছে, চুপসে গিয়েছে শুকদেও বেয়ারার মুখটা।

কিন্তু একটুও চুপসে যায় নি ভিলা মাধবীর চেহারা। ইউকালিপটাস আর ঝাউগুলির চেহারা একটুও বুড়ো হয় না। বারান্দার কার্পেট কোথাও একটুও ছিঁড়ে যায় না। এক-একটা বর্ষা পার হয়, তবু দেয়ালের গোড়াতে একটু শেওলাও ধরে না।

জ্ঞানবাবুর একটা ধারণা, বেশি ড্রিঙ্ক করে করে সেন-সাহেবের চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভিলা মাধবীতে এসে একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন, তা নয়; সেনসাহেব শুধু শান্ত হয়ে ইজিচেয়ারে বসে, ভিলা মাধবীর যত গাছ লতাপাতা ফুল ও আলো-ছায়ার দিকে তাকিয়ে, আর, শুধু হেসে হেসে বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

যত ডাক বাংলো আর ফরেস্ট-বাংলোর চাপরাশিদের অনেকেই মাঝে-মাঝে এসে সুজীবন সেনের সামনে দাঁড়ায় আর সেলাম জানায়। ওদের আক্ষেপ, সাহেব কেন আর শিকারে যান না। সুজীবন সেন সবারই হাতে একটা-দুটো

টাকা বকসিস ধরিয়ে দেন আর জঙ্গলের নতুন জানোয়ারের খবর শোনেন।

শুধু শোনাই সার। সুজীবন সেনের কর্ডাইট রাইফেল আর ছটফট করে ওঠে না। এক গুলিতে নীলগাইয়ের ধড় মাটিতে লুটিয়ে দেবার জন্য সুজীবনের মনের মধ্যে যেন আর কোন পিপাসাই নেই।

বড়কা-গাঁওরের জঙ্গলে চৌশিঙ্গা দেখা দিয়েছে। গয়া থেকে এক সাহেব এসে ইচাকের কাছে খোলা মাঠের মধ্যেই একটা সাদা বাঘ পেয়েছেন আর মেরেছেন। সিমারিয়ার জঙ্গল থেকে দাঁতাল শুয়োর বের হয়ে রোজই মাহাতোদের আলুর ক্ষেত তছনছ করছে। এই তো, এত কাছে ওই কানারি হিলের কাছে সড়কেরই উপর দুটো ভালুক রোজ রাতে একবার আসে আর চলে যায়। নতুন হাঁস নেমেছে চিতরপুরের ঝিলে।

খবরগুলিকে শুধু একটা ক্লান্ত হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করেন আর নীরব হয়ে বসে থাকেন সুজীবন সেন। সুজীবন সেন নিজেই যেন একটা ক্লান্তির গল্প হয়ে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে চাইছেন।

কিন্তু সুজীবন সেন তাঁর মেয়ে রঞ্জিতা সেনের জীবনটাকে সুখী করে হাসিয়ে রাখবার জন্যে যা করা দরকার তার কিছুই না করে ছাড়েন নি। বছরের নয়টি মাস কনভেণ্ট, তারপর মাসখানেক রাঁচিতে পিসির কাছে; তারপর মাস দুই বাপের

কাছে ; তিনটি আশ্রয়ের স্নেহ আর প্রীতি রঞ্জুকে এক মুহূর্তের জন্যেও মনমরা হতে দেয় নি। আজকাল কার্সিয়ং থেকে কনভেণ্টের মিসেস ডি' সিলভা নিজেই রঞ্জুকে রাঁচিতে পৌঁছে দিয়ে যান। আর, রঞ্জুর কার্সিয়ং রওনা হবার ঠিক একদিন আগে কনভেণ্টের মাদার মণিকা কলকাতা থেকে এখানে চলে আসেন আর রঞ্জুকে নিয়ে যান। সঙ্গে যায় বেয়ারা শুকদেও। গত বছর রঞ্জুকে দেড় হাজার টাকা দামের একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছেন সুজীবন। কলকাতার তিনটে প্রভিশন স্টোরের দোকানে টাকা জমা দিয়ে রেখেছেন সুজীবন; রঞ্জু চিঠি লিখে যখন যে-জিনিসের অর্ডার দেবে, তখনই যেন সে-জিনিস রঞ্জুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

গত বছরের মত এ-বছরেও ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহের সোমবারের সকালবেলার রোদ যখন ভিলা মাধবীর লনের ঘাসের সব শিশির গলিয়ে দিতে থাকে, তখন সুজীবন সেনের মুখটা করুণ হয়ে যায়। কালই এসে গিয়েছেন মাদার মণিকা, আজ এখনই রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে কার্সিয়ং রওনা হয়ে যাবেন। ড্রাইভার মোতিরাম গাড়ি বের করেছে। শুনতেও পাওয়া যায়, চায়ের টেবিলের কাছে বসে গল্প করছেন মাদার মণিকা আর বড়দি। রঞ্জুর গলার স্বরও শোনা যায়। কথা বলছে রঞ্জু যেন সকালবেলার একটা খুশির পাখি মিষ্টি স্বরে ডাকছে। বুঝতে পারেন সুজীবন, ওরা সবাই সুজীবনের অপেক্ষা করছে।

রঞ্জু ডাকে—বাবা, এস।

কী অদ্ভুত ডাক! সুজীবন সেনের বুকটা যেন মিষ্টি বাতাসে ভরে যায়।

কিন্তু আর কতক্ষণ ? চা খাওয়ার পালা শেষ হবার পর রঞ্জুর হাত ধরে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যান সুজীবন। গাড়িতে ওঠে রঞ্জু। মাদার মণিকাও উঠে বসেন। কিন্তু বিপদে পড়ে ড্রাইভার মোতিরাম। গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আর বাম্পারের উপর একটা পা তুলে দিয়ে, আনমনার মত, কে জানে কোন দিকে তাকিয়ে পাইপ টানতে থাকেন সুজীবন। সাহেব সরে না গেলে মোতিরাম যে গাড়ি স্টার্ট করতেই পারবে না।

গাড়ির ভেতর থেকে নেমে আসে রঞ্জু। সুজীবনের মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে সুজীবনের গালের উপর গাল পেতে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জু, তারপর হাসতে থাকে—আমাদের যেতে দাও বাবা। তুমি এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে বস।

গাড়িতে ওঠে রঞ্জু। বস্‌, তারপর আর কোন বাধা থাকে না। সুজীবন সেনের জীবনের নতুন নেশাটা খুশি হয়ে গিয়েছে। সরে যান সুজীবন। অবাধ পথ পেয়ে গাড়িটা এইবার ছুটে চলে যায়।

সুজীবন বলেন—আর কি বড়দি ? রঞ্জু আর-একটু বড় হলেই একদিন ওর বিয়েটা দিয়ে দেব। তারপর আমার ছুটি।

বড়দি বেশ জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়েন।—আমি বেঁচে থাকতে থাকতে রঞ্জুর বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল হত। তা কি আর হবে ?

সুজীবন—নিশ্চয় হবে।

কিন্তু দেখে খুশি হয়েছেন বড়দি, তাঁর ভাইয়ের জীবনে সেই ভয়ানক কোলাহলের সব শব্দ শান্ত হয়ে গিয়েছে।

জীবুর কথা শুনেই বোঝা যায় ; ওর মনের সেই আগুন আর নেই। শুনে খুশি হয়েছেন বড়দি, জীবু এখন থেকেই রঞ্জুর বিয়ের কথা চিন্তা করছে। খুব ভাল কথা। বড়দির মনটাও একটা শান্তি পেয়েছে। জীবুরও তো বয়স হয়েছে। সময়ে সব তাপই শান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সেদিনই অনেক রাতে বড়দির চোখ দুটো হঠাৎ চমকে উঠে আতঙ্কে ভরে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলেন বড়দি, তাপ যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে।

ঘুম আসছে না, তাই ঘুমের একটা পিল খাবেন বলে বিছানা থেকে নেমেই দেখতে পেলেন বড়দি, পাশের ড্রইং-রুমের অন্ধকারে সুজীবনের পাইপটার আগুন যেন একটা লালচে জ্বালা হয়ে দপ্ দপ্ করছে।

সুইচ টিপে আলো জ্বালেন বড়দি।—এ কি জীবু! তুমি এখনও ঘুমোও নি কেন ?

সুজীবন হাসেন—আমি তো রাত্রিবেলা ঘুমোই না বড়দি।

—কেন ? রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন বড়দি।

সুজীবন আবার হাসেন।—একটা অস্বস্তি। ভয়ানক বিশ্রী লাগে। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? আমি দিনের বেলা সোফার উপর পড়ে একবার বেশ ভাল করে ঘুমিয়ে নিই।

বড়দি—কিন্তু অস্বস্তি আবার কেন ?

এবার আর পাইপের আগুন নয় ; সুজীবন সেনের চোখ দুটোই দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—ঘেন্না করে। রাত্রিবেলা ও-ঘরে ঢুকতে, আর ওই খাটের বিছানাটাকে ছুঁতেও ঘেন্না করে।

—খুব ভুল করছ, জীবু! খুব অন্যায় করছ। কেঁদে ফেলেন বড়দি।

বড়দিরও আজকাল এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। একটুকুতেই ভয় পান আর কেঁদে ফেলেন।

বড়দিরও তো বেশ বয়স হয়েছে। আজকাল চোখে একটু কম দেখেন। চলতে ফিরতে বেশ হাঁপিয়েও পড়েন।

পরদিন সকালে রাঁচি রওনা হবার সময় যখন গাড়িতে উঠলেন বড়দি, তখন ভিলা মাধবীর ঝাউয়ের শব্দ শুনে আর-একবার ভয় পেয়ে চমকে উঠলেন আর চোখ মুছলেন।

বেড়াতে বের হয়ে টাউনের আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু গল্প করতে করতে যেদিন সিংহানি পর্যন্ত চলে এলেন, সেদিন ভিলা মাধবীর গেটের কাছে একবার থমকে দাঁড়িয়ে আর বেশ ভাল করে দেখে নিলেন, সেনসাহেব লনের ঘাসের উপর একটি চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সেনসাহেবের মাথাটা আরও সাদা হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, একটু ঝুঁকে পড়েছেন সেন সাহেব।

আদিত্যবাবু—কত বয়স হল সেনসাহেবের ?

জ্ঞানবাবু—তা পঞ্চাশ তো কবেই পার হয়ে গিয়েছে। তবুও, বয়সের তুলনায় মাথাটা একটু বেশি সাদা হয়েছে।

আদিত্যবাবু—তাহলে আর বিয়ে-টিয়ে করবেন বলে মনে হয় না।

জ্ঞানবাবু হাসেন—না, করলে তো আট বছর আগেই করতেন। এখন তো মেয়ের বিয়ে দেবার কথা।

আদিত্যবাবু—মেয়েটির বয়স কত হবে এখন ?

জ্ঞানবাবু—ধরুন না, সেনসাহেবের ডিভোর্স নেবার সময় মেয়েটির বয়স প্রায় দশ বছর ছিল। তার সঙ্গে আরও আটটা বছর যোগ করুন। মেয়েটির বয়স তাহলে গিয়ে দাঁড়ায়, এই সতেরো-আঠারো।

ঠিকই হিসাব করেছেন জ্ঞানবাবু। বিকেলে রাঁচি থেকে

বড়দির গাড়িটা ছুটে এসে যখন ভিলা মাধবীর লনের কাছে থামে, তখন বড়দির সঙ্গে সঙ্গে শাড়িপরা একটি আঠারো বছর বয়সের মেয়েও গাড়ি থেকে নামে। ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি, বেশ বড় একটা খোঁপা, হাতে সোনার সরু চেন-ব্যাণ্ডের সঙ্গে পাতলা একটি সোনালী ঘড়ি ; এক হাতে গরম ওভার-কোট জড়িয়ে ধরে আর হাসতে হাসতে সুজীবনের চোখের কাছে এসে যে মেয়েটি দাঁড়ালো, সে মেয়ে আর-কেউ নয়, সুজীবন সেনেরই মেয়ে রঞ্জিতা সেন।

এগিয়ে গিয়ে সুজীবনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর দুলে দুলে হাসতে থাকে রঞ্জু।—তোমার জন্যে আমি একটা জিনিস এনেছি, বাবা ; একটা তিব্বতী টুপি।

দুই চোখ অপলক করে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন। খুশি হয়ে হাসতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসিটা যেন ভয়ানক এক বিস্ময়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে ছটফট করে ওঠে। আজ হঠাৎ কোথা থেকে কার চেহারা দিয়ে নিজেকে এমন করে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে রঞ্জু? সেই চোখ, সেই ঠোঁট, গলাতেও ঠিক সেই রকম দুটো খাঁজ। চোখ দুটো বন্ধ করতে ইচ্ছে করে ; চেঁচিয়ে ডাকতে ইচ্ছে করে—একি হল, বড়দি? রঞ্জু যে আমাকে ভয়ানক ঠাট্টা করছে।

হাতে-ধরা গরম জামাটাকে সুজীবনের কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে বাগানের ফুল দেখতে ছুটে যায় রঞ্জু। খানসামা স্টিফান ডাকতে থাকে—আগে চা খেয়ে নাও, মিস বাবা। তারপর যত খুশি বাগান দেখ।

বড়দি বলেন—মিসেস ডি' সিলভা এবার এসে রঞ্জুর কত

প্রশংসা করলেন। রঞ্জু শুধু এক অঙ্ক ছাড়া সব সাবজেক্টে ফার্স্ট হয়েছে।

সুজীবন হাসতে চেষ্টা করেন।—হিস্ট্রিতেও ফার্স্ট হয়েছে কি?

বড়দি—নিশ্চয়; শুধু অঙ্ক ছাড়া সব বিষয়ে···।

সুজীবন সেন হঠাৎ অদ্ভুতভাবে বড়দির দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত কথাই বলে ফেলেন—হিস্ট্রিতে ফেল করলেই ভাল করত রঞ্জু।

চমকে ওঠেন বড়দি। ভাই সুজীবন কি নেশার মেজাজে কথা বলছে?

সুজীবন—কিছু মনে করো না, বড়দি। তোমার এসব খুশির কথা শুনে আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগল না।

বড়দিও বেশ রাগ করে কথা বললেন।—তোমার এসব কথা শুনে আমারও একটুও ভাল লাগছে না।

সুজীবন—তুমি কি চাও যে, রঞ্জু ঠিক মায়ের মত মেয়ে হয়ে উঠুক?

বড়দি—কখ্খনো না। আমি কি পাগল? কেঁদে ফেললেন বড়দি।

সুজীবন হাসতে চেষ্টা করেন।—আঃ, আমি ঠাট্টা করে একটা কথা বললাম, তুমি তাই বিশ্বাস করে কেঁদে ফেললে?

বড়দি—ওকথা ঠাট্টা করেও বলতে নেই।

তর্ক করে বড়দিকে আর বিরক্ত করতে চান না সুজীবন, তাই বেশ শান্ত দুটো চোখ নিয়ে, বড়দির উপদেশের বাধ্য ভাইটির মত শুধু নীরব হয়ে বসে থাকেন। বড়দিও খুশি

হয়ে বলেন—রঞ্জু হল রঞ্জু, তোমার মেয়ে, ডাক্তার প্রশান্ত সেনের মত মানী মানুষের নাতনি। আজে-বাজে মানুষের সঙ্গে রঞ্জুর তুলনা করা উচিত নয়।

সুজীবন—খুব সত্যি কথা।

বড়দি—কাজেই তুমি ভুল করে কোন বাজে ভয়-টয় করবে না।

সুজীবন—একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছি বলেই ভয় করতে হচ্ছে।

বড়দি—কিসের আশ্চর্য ?

হেসে ফেললেন সুজীবন—বায়োলজির আশ্চর্য।

বড়দি—তার মানে ?

সুজীবন—অবিকল চারু রায়ের মেয়ের চেহারাটি পেয়েছে রঞ্জু।

বড়দি আবার ভ্রূকুটি করেন।—এটা কি রঞ্জুর ভুল ?

সুজীবন আবার হেসে ফেলেন—আমার ভুল। আমি বায়োলজি পড়ি নি। শুধু সারা জীবন পাথরের লজি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। তাই ঠিক বুঝতে পারছি না।

বড়দিও হেসে ফেললেন।—তবে আর তর্ক করো না।

সুজীবন—কিন্তু, কী ভয়ানক বায়োলজি! চারু রায়ের মেয়েরই চেহারাটা বেচারা রঞ্জুর ঘাড়ে চেপে বসল কেন ? রঞ্জু তো তোমার চেহারা পেতে পারত ?

বড়দি হাসেন।—ভগবান তোমার প্রশ্নের জবাব দিন ; আমি দিতে পারব না।

সুজীবন—তোমাদের বেশ একটা সুবিধে আছে, বড়দি।

যত গোলমালের জবাব দেবার দায় ওই একজন দারোগার উপর চাপিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে যাও।

বড়দি—ওভাবে কথা বলো না।

সুজীবন—সে গল্পটা জান না? গাঁয়ের লোক সব প্রশ্নের জবাবে শুধু একটি কথা বলত, দারোগা জানে! গাঁয়ে কলেরা লাগল কেন? দারোগা জানে। জলের বাঁধ ভেঙে গেল কেন? দারোগা জানে। ধান হল না কেন? দারোগা জানে। বেচারা ম্যাজিস্ট্রেট গাঁয়ের দুরবস্থার কারণ তদন্ত করতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

বড়দি—আমিও একটা গল্প বলতে পারি। গাঁয়ের এক মাসি ছিল; ঝগড়া বাধাবার জন্যে যখন কাউকে দেখতে পেত না, তখন নিজেই সুপুরি গাছের সঙ্গে চুল বেঁধে নিয়ে ছাড়-ছাড় বলে চেঁচাত।

সুজীবন—আমিও কি তাই করছি?

বড়দি—করছ বইকি। কবেকার কোন ছাই ব্যাপার, যেটা চুকে-বুকে মিটেও গিয়েছে, তারই সঙ্গে এখনও মনে মনে ঝগড়া করেই চলেছ।

সুজীবন—ঝগড়া নয়, ঘেন্না।

বড়দি—বড় অদ্ভুত ঘেন্না। কোন মানে হয় না।

সুজীবন—মানে হক বা না হক; একটা ভয়ানক মেয়েলোকের চেহারার সঙ্গে রঞ্জুর চেহারার কোন মিল না থাকলেই ভাল ছিল।

বড়দি বিড়বিড় করেন—আমি তো তেমন কিছু মিল দেখি না।

সুজীবন—তুমি তো আজকাল চোখে কম দেখ।

বড়দি এবার বিরক্ত হয়ে সরেই যান।—তুমি চোখে একটু বেশি দেখছ।

বড়দি ঘরে নেই; হুইস্কির আলমারির চাবিটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। চুপ করে আবার চেয়ারের উপরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সুজীবন। বড়দির রাগের কথার ধমকটা নয়; যেন বিদ্‌ঘুটে একটা নিয়মছাড়া ভাগ্যের ধমক সুজীবনকে চুপ করিয়ে, স্তব্ধ করিয়ে, আর একলা করে দিয়ে ঘরের ভিতরে এই চেয়ারে বসিয়ে রেখেছে।

কিন্তু বড়দি যেন সব বুঝেও কিছুই বুঝতে পারলেন না। মায়ের চেহারা পেয়েছে মেয়ে, মানুষের জগতের এই সাধারণ নিয়মের সত্যটা যে সুজীবনের জীবনে একটা অভিশাপের জয় ছাড়া আর কিছু নয়। রঞ্জুকে দেখলে ভয় করবে, রঞ্জুকে দেখলে চোখ ঘিন-ঘিন করে উঠবে, এ শাস্তি কেমন করে সহ্য করবেন সুজীবন? বুকের ভিতরে এখন হুইস্কির নেশার জ্বালা থাকলে চেঁচিয়ে বলে দিতে পারতেন সুজীবন—বুঝতে পারছ কি বড়দি; চারু রায়ের মেয়ে আমার কী ভয়ানক ক্ষতি করে দিল? আজ রঞ্জুকে চোখে দেখতেও আমার ভয় করছে।

চুপ করে বসে শুধু দেখতে থাকেন সুজীবন, রঞ্জুর সঙ্গে গল্প করে করে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বড়দি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাই রঞ্জুর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেয়ে ভিলা মাধবীর ইউ-কালিপটাসের পাতার মর্মরও শান্ত হয়ে গিয়েছে।

সুজীবন সেনও শান্ত হয়ে বসে থাকতে চাইছেন। কিন্তু পারলেন না। হঠাৎ চমকে উঠতে হল। যেন ভিলা মাধবীর বুকটা ঝংকার দিয়ে হঠাৎ বেজে উঠেছে। পিয়ানো বাজছে।

উঠে দাঁড়ালেন সুজীবন সেন। এগিয়ে গেলেন। একটা ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। দেখতেও পেলেন, সে ঘরের আলোর উপর রঙীন শেড টেনে দেওয়া হয়েছে। বড়দি একটা কোচের উপর বসে আছেন। আর দু-হাত চালিয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে রঞ্জু।

এক ফোঁটাও হুইস্কি খান নি সুজীবন সেন, চোখ দুটোও লাল হয়ে ওঠে নি। তবু, বিনা নেশার চোখ দুটোও যেন মাঝে মাঝে ভুল করে দেখে ফেলছে, রঞ্জু যে ঠিক সেই মানুষটারই মত বিহ্বল দুটো চোখ নিয়ে একমনে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। কিসের সুর বাজাচ্ছে রঞ্জু? ঠিক যে সেইরকমই একটা 'সোনাটা' বলে মনে হয়।

ঘরটাকে একটা হেঁয়ালির ঘর বলে মনে হয়। দেখতে আশ্চর্য লাগে আর ভয় করে। ঘেন্না করে আর ভাল লাগে। শান্তি পাওয়া যায়, আর ভয়ানক অস্বস্তি হয়। রঞ্জুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুজীবন, কিন্তু ঘরের ভিতরে আর ঢুকলেন না।

জীবু ঘরের ভিতর না এসে চলে গেল কেন? বড়দির মনে একটা খটকা লেগেছে। দরজার পর্দার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

থেকে তারপর হঠাৎ ওভাবে একেবারে টলমল হয়ে চলে গেল জীবু; স্টিফান কি আলমারির লুকনো চাবিটা বের করে দিয়েছে? না, আলমারির কাচ ভেঙে বোতল বের করে ফেলেছে জীবু?

ছি-ছি, ডাক্তার এত করে বলে গিয়েছেন, ও-জিনিস এখন এখন আর স্পর্শ না করাই ভাল; নইলে শরীরের ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে! জীবুর কি তবুও একটু ভয় হয় না? একটুও না।

উঠলেন বড়দি; এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেলেন, বারান্দার একটি চেয়ারে চুপ করে বসে আছে তাঁর বাহান্ন বছর বয়সের দুরন্ত অবাধ্য ভাই, কিন্তু কী ভয়ানক দুঃখী ভাই।

কিন্তু সুজীবনের হাতে হুইস্কির গেলাস নেই। হাত দুটোকে শক্ত করে বুকের উপর চেপে ধরে যেন একটি সুকঠিন গ্র্যানাইট হয়ে বসে আছেন সুজীবন।

বড়দি—কি হল জীবু?

সুজীবন--কিছু না।

বড়দি—এখানে এভাবে চুপ করে বসে আছ কেন? ও-ঘরে চল।

সুজীবন—না।

বড়দি—রঞ্জু কী সুন্দর মিষ্টি সুর বাজাচ্ছে, শুনবে চল।

সুজীবন—না।

বড়দি—রঞ্জুর সঙ্গে একটু গল্প করবে, চল।

সুজীবন—না।

বড়দি ডাকেন—রঞ্জু, এখানে এস।

সিল্কের শাড়ির আঁচল দুলিয়ে ছুটে আসে রঞ্জু।

বড়দি বলেন—বস। তোমার কার্সিয়ংয়ের গল্প বল, শুনি।

রঞ্জু একটা চেয়ারে একটু বসে নিয়েই ছটফট করে উঠে দাঁড়ায়।—না, এখন গল্প করব না। বাবার একটা ফটো তুলব।

ক্যামেরা নিয়ে এসে সুজীবনের সামনে দাঁড়িয়েই রঞ্জু চেঁচিয়ে ওঠে।—বুকের উপর থেকে হাত দুটো নামিয়ে দাও বাবা। বিশ্রী দেখাচ্ছে।

সুজীবনের হাত দুটো সেই মুহূর্তে কেঁপে ওঠে আর শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে।

রঞ্জু বলে—আঃ, ও-রকম স্টিফ হয়ে বসে আছ কেন? চেয়ারের পিঠে গা হেলিয়ে দাও।

তখনি চেয়ারের কাঁধের উপর একটা হাত তুলে দিয়ে আর গা হেলিয়ে বেশ একটু কাত হয়ে বসেন সুজীবন।

রঞ্জু—পাইপটাকে ও-রকম শক্ত করে খিমচে ধরে রয়েছ কেন? মুঠোটা ঢিলে করে দাও, একটু আলগা করে ধর।

পাইপটাকে বেশ আলগা করেই ধরে রইলেন সুজীবন। কঠোর গ্র্যানাইট যেন রঞ্জুর এক-একটা হুকুম আর ধমকের শব্দ শুনে চমকে উঠছে আর নরম কাদা হয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জু বলে—একবার তাকাও; ক্যামেরার দিকে নয়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক। ভাল করে চোখ খুলে তাকাও।

দুই চোখ অপলক করে রঞ্জুব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন

সুজীবন। ক্যামেরা ক্লিক করেই এগিয়ে আসে রঞ্জু।—কাল সকালে তোমাকে তিব্বতী টুপিটা পরিয়ে লনের উপর তোমার একটা ফটো নেব।

—তুমি আমাকে কী পেয়েছ, রঞ্জু? আমি কি একটা খোকা? রঞ্জুর একটা হাত ধরে আর রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন সুজীবন।

রঞ্জু—তুমি একটি বোকা। সব সময় এত গম্ভীর হয়ে বসে থাক কেন?

বড়দি এতক্ষণ মুখ টিপে হাসছিলেন, এইবার একেবারে মুখে খুলে হেসে ওঠেন—খুব করে বল রঞ্জু; আরও বল; সেনসাহেব একটু ভাল করে বুঝুন, মিছিমিছি এত গম্ভীর হয়ে থাকবার কোন মানে হয় না।

সুজীবন হাসেন—বেশ, কথা রইল, আর কোনদিন গম্ভীর হব না।

রঞ্জু—মনে থাকে যেন।

সুজীবন—নিশ্চয়।

রঞ্জু—আমি তাহলে এখন যাই, তুমি পিসির সঙ্গে গল্প কর।

সুজীবন—তুমিও এখানে বস, দুচারটে বাঘের গল্প শোন।

রঞ্জু—শুনব; কিন্তু নমিতাকে একটা চিঠি লিখে আসি।

সুজীবন—কে নমিতা?

রঞ্জু—কলকাতার নমিতা; আমার বন্ধু। নমিতাও কনভেণ্টে পড়ে।

কলকাতার বন্ধু নমিতাকে চিঠি লিখতে বেশ দেরি হয়েছে রঞ্জুর; তাই আর এই বারান্দাতে নয়, রাতের খাবারের টেবিলের কাছে বসে, খাওয়া শেষ হবার পরও প্রায় দুটি ঘণ্টা ধরে বাঘের গল্প বললেন সুজীবন। টাউন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছাড়োয়া জঙ্গলের বাঘ একবার সুজীবনের একটা সাইকেলকে একলা পেয়ে জঙ্গলের প্রায় তিন মাইল ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কুলগাছের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।

রঞ্জুর হাসি থামে। দেয়ালের ঘড়িতে রাত এগারটার সঙ্কেতও টুং-টাং করে বাজতে থাকে। বড়দি বলেন—না আর নয়। আজকের মত তোমার গল্প থামিয়ে রাখ, জীবু।

আজও মাঝরাতে একবার; আর শেষ রাতে একবার বিছানা থেকে নেমে পাইপ ধরিয়েছেন সুজীবন। কিন্তু সে-ঘরের খাটের বিছানাতে নয়, অন্য একটা ঘরের খাটে নতুন করে পাতা একটা বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছে, রাত জেগে সোফার উপর বসে থাকবার সুবিধে পান নি। বড়দি আগেই শাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়দির শাসানির জন্যে নয়, রঞ্জুরই ভয়ে এই ঘরের ভিতরে ঢুকে এই নতুন বিছানায় গড়িয়ে পড়তে হয়েছে। বড়দি স্পষ্ট করে না বলেও বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাত জেগে সোফার উপর বসে থাকলে হয়তো রঞ্জু নিজেই এসে ধমক দেবে। তখন তো রঞ্জুর কথা না শুনে পার পাওয়া যাবে না।

বড়দি ঘুমিয়ে আছেন, রঞ্জু ঘুমিয়ে আছে। উঁকি দিয়ে দেখছে না। শুধু এক ভিলা মাধবীর অন্ধকারটাই যেন দেখতে পাচ্ছে সুজীবন সেনের পাইপের মুখটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। সেই পুরনো জ্বালা জেগেই আছে। চারু রায়ের মেয়েকে ক্ষমা করতে পারবেন না সুজীবন সেন।

বড়দির কাছ থেকে একটা কথা জানতে পেরে খুশি হয়েছেন সুজীবন, রঞ্জু কোনদিনও ওর মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করে নি। সুজীবনও তো নিজের চোখে দেখেছেন, আয়া বুড়িটা মরে গিয়েছে শুনে কত কেঁদেছিল রঞ্জু। কিন্তু চারু রায়ের মেয়েকে দেখতে না পেয়ে এই আট বছরের মধ্যে কোনদিনও কাঁদে নি। শুধু সেই প্রথমবার কনভেণ্টে যাবার আগে বড়দিকে একবার শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, মা কবে আসবে ?

নমিতা নামে একটি বন্ধু আছে রঞ্জুর। কিন্তু নমিতার কাছে কি কোনদিনও বলতে পেরেছে রঞ্জু, কোথায় ওর মা ? নিশ্চয় বলতে হয়েছে, মা নেই। থেকেও না-থাকা এমন একটা ভয়ানক মাকে আরও ঘেন্না করতে শিখুক রঞ্জু।

হুইস্কির আলমারির চাবিটাকে খুঁজতে চেষ্টা করেন সুজীবন ; কিন্তু খুঁজে পান না।

কিন্তু ভোরের আলোর ছোঁয়া লেগে ভিলা মাধবীর ইউ-কালিপটাসের কুয়াশা-ভেজা পাতা চিকচিকিয়ে উঠতেই সুজীবন সেনের এই রাতজাগা নিদারুণ ঘৃণার নীরব ধ্যান কোথাও যেন পালিয়ে গিয়ে আর মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকে ! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও সুজীবন সেনের আর গম্ভীর হয়ে থাকবার সাধ্যি হয় না। একটু আনমনা

হবারও উপায় নেই। লনের চারদিকে ঘুরে-ঘুরে রঞ্জুর সঙ্গে বেড়াতেই হয়। রঞ্জুর প্রত্যেকটি হাসির সঙ্গে হাসতে হয়। তিব্বতী টুপি মাথায় দিয়ে ফটো তুলতে হয়েছে। শুধু ছাড়োয়া জঙ্গলের বাঘের গল্প নয়; পালামৌ জঙ্গলের বাইসন শিকারের গল্পও বলতে হয়েছে। ওই যে দেখা যাচ্ছে, খুব কাছেই, জোড়া পাহাড়ের একটা পাহাড়ের মাথায় অনেককাল আগের একটা বুরুজ দাঁড়িয়ে আছে, তারই ভিতরে প্রকাণ্ড একটা সাপ মেরেছিলেন সুজীবন, প্রকাণ্ড একটা পাইথন।

প্রায় রোজই সকালে স্টিফান খানসামাকে রান্নার উপদেশ দিয়ে বড়দি কিচেনের বাইরে এসে দেখেছেন, রঞ্জুর ফটো তুলছে জীবু। রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যামেরা ধরেছে জীবু; যেন দুটো মুগ্ধতার চোখ রঞ্জুর মুখটাকে দেখে দেখে অনেক-দিনের অদেখার শোধ তুলছে। জীবু যেন একেবারে প্রাণের সাধ মিটিয়ে রঞ্জুর মুখটাকে দেখছে আর হাসছে। বাঃ, এক-এক সময় সন্দেহ হয় বড়দির, চারু রায়ের মেয়ের মুখের সঙ্গে রঞ্জুর মুখের মিল আছে বলেই কি এত খুশির হাসি হাসছে সুজীবন? যেমন সুজীবনের রাগের, তেমনই সুজীবনের হাসিরও কোন তাল খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাক, তবু ভাল। শুধু মনমরা হয়ে আর মুখভার করে, একটা যুগ পার করে দেবার পর বড়দির ভাই জীবু আজ হাসছে। রঞ্জুকে দেখতে ভয় করবে, ইস্, কী সব অদ্ভুত কথা! কই, এখন ভয় করছে না? বড়দির মুখটাও শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে থাকে।

মাদার মণিকা ঠিক তারিখেই দেখা দিলেন, আর ঠিক পরের দিনই রঞ্জুকে নিয়ে কার্সিয়ং চলে গেলেন।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা সিংহানির সড়ক ধরে বেড়িয়ে বাড়ি ফেরবার সময় আদিত্যবাবু বলেন—কই? ভিলা মাধবীতে আজ পিয়ানো বাজে না কেন? সেনসাহেবের মেয়ে কি চলে গেল?

ভিলা মাধবীর মাধবী নেই, তবু নামটা ভিলা মাধবী। আদিত্যবাবুর মত মানুষ, যিনি এখন ভাল করেই জানেন যে, মাধবীলতা নয়, সেনসাহেবের মেয়ে রঞ্জিতাই এই একটা মাস পিয়ানো বাজিয়েছে, তিনিও বলেন—ভিলা মাধবী।

সুজীবন সেনের জীবনে আর কাজ নেই, শিকার নেই, হুইস্কিও নেই, শুধু আছে একটি অপেক্ষা, রঞ্জু আবার কবে আসবে ?

এই অপেক্ষার তৃপ্তি হয়ে রঞ্জুও প্রতি বছরেই ঠিক সময়ে সুজীবন সেনের চোখের কাছে দেখা দেয়। দু-এক মাস থাকে, তারপর চলে যায়। কনভেণ্টের মিসেস ডি' সিলভা জানিয়েছেন, কোন চিন্তা করবেন না, রঞ্জিতার জন্যে আমাদের যত্নের অন্ত নেই। রঞ্জিতা নিজেও ফুলের মত সুখী, হ্যাপি লাইক এ ফ্লাওয়ার।

হ্যাঁ, রঞ্জু এখন আর কনভেণ্টের স্কুলের ছাত্রী নয়। স্কুলের পড়া কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে। রঞ্জু এখন কনভেণ্টের স্কুলেরই একজন শখের শিক্ষিকা।

সুজীবন বলেছিলেন, তাই বড়দি কনভেণ্টের মিসেস ডি' সিলভাকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন: খুবই আনন্দের কথা, রঞ্জিতা এখন ফুলের মত সুখী ; এই সুখী ফুলের জন্যে আপনাদের যত্নেরও অন্ত নেই। তবু, বিশেষ অনুরোধ এই যে, ফুলের জন্যে আপনাদের একটু সাবধানতাও যেন থাকে। মনের কথাটা আপনাকে স্পষ্ট করেই বলে দিতে চাই ; রঞ্জিতা যেন নিজের ইচ্ছেতে কোন কাণ্ড করে না ফেলে। বিশ্বাস করি, কনভেণ্টের মেয়েরা বাইরে মেলামেশা করবার সুযোগ পায় না। আশা করি, আপনাদের যত্নের

ফুল সব সময় শুধু আপনাদেরই চোখের কাছে থাকবে আর হাসবে। যতদিন না রঞ্জিতার বিয়ের ব্যবস্থা করছি, ততদিন রঞ্জিতাকে সাবধানে রাখবার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করবেন। ধন্যবাদ।

জ্ঞানবাবু দেখেছেন, সেনসাহেবের মাথাটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডাক্তার ঘোষ বলেছেন, সেনসাহেব প্রায় পাঁচ বছর হল মদ ছেড়ে দিয়েছেন। তবে? সেন-সাহেবের এই বয়সেই মাথার সবটা সাদা হয়ে গেল কেন?

আদিত্যবাবু—এখনও তো ষাট হয় নি সেনসাহেবের।

জ্ঞানবাবু—না না, ষাট কেন হবে? পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন কিংবা বড় জোর সাতান্ন-আটান্ন হবে।

আদিত্যবাবু—তাহলে মেয়েটিরও তো বেশ বয়স হয়েছে।

জ্ঞানবাবু—হ্যাঁ, তেইশ-চব্বিশ তো হবেই।

ঠিকই হিসেব করেছেন জ্ঞানবাবু। কদিন আগে রাঁচি থেকে বড়দির চিঠি পেয়েছেন সুজীবন সেন—রঞ্জুর বয়স চব্বিশে দাঁড়িয়েছে। এখন বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয়। আর দেরি করা চলে না। দেরি করা উচিতও নয়।

বড়দির চিঠি পড়ে খুশি হতে পারেন নি সুজীবন। কে বলছে দেরি করতে? সুজীবন তো এই পাঁচ বছরের প্রত্যেক বছরেই অন্তত তিন-চারবার বড়দিকে অনুরোধ করেছেন, রঞ্জুর জন্যে একটি পাত্র খুঁজে দাও।

বড়দিও বলেছেন—খোঁজ করা হচ্ছে। কোন চিন্তা করো না। মণ্টু বলেছে, রেলওয়েতে বেশ ভাল চাকরি করে, চমৎকার একটি ছেলে আছে।

সুজীবনও তাই বেশ একটু বিচলিত ভাষায় বড়দির চিঠির জবাব দিয়ে দিলেন।—আমার তো অস্ত যাবার সময় হয়ে এল, বড়দি। আমি আর এখানে এ-বাড়িতে থাকতে চাই না। সিমলা স্যানাটোরিয়ামে টাকা জমা করে দিয়েছি। যত তাড়াতাড়ি পারি, সেখানে চলে যেতে চাই। কিন্তু তার আগে রঞ্জুর বিয়েটা হয়ে গেলেই কি ভাল হত না? তুমি যে বলেছিলে মণ্টুর চেনা খুব ভাল একটি ছেলে আছে, সেই ছেলের সঙ্গে রঞ্জুর বিয়ে ঠিক করে ফেললেই তো হয়।

সুজীবনের চিঠি পড়ে কেঁদে ফেললেন বড়দি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাবও দিয়ে দিলেন।—হ্যাঁ, বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছে।

বড়দির চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছেন সুজীবন; কিন্তু যেন একটু চমকেও উঠেছেন। চিঠিটাকে একটা হঠাৎ-আশ্চর্যের বার্তা বলে মনে হয়। একদিনের মধ্যেই কেমন করে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেললেন বড়দি?

ঠিক দুদিন পরে বড়দির গাড়িটাও হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে রাঁচি থেকে ছুটে এসে ভিলা মাধবীর লনের কাছে থামে। বড়দি এসেছেন। দেখতে পেয়ে সুজীবন সেনের চোখ দুটো চমকে ওঠে। আসবার আগে টেলিফোনে একটা খবরও দেন নি বড়দি। বড়দির এই হঠাৎ আবির্ভাবও যেন একটা হঠাৎ-বিস্ময়ের আগমন।

সুজীবন এগিয়ে গিয়ে আর হাত বাড়িয়ে বড়দিকে ধরে গাড়ি থেকে নামালেন।—তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন বড়দি?

বড়দির শরীরটা বেশ কুঁজো হয়ে গিয়েছে। বেশ চেষ্টা

করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বড়দি।—হাঁপাবার বয়স হয়েছে জীবু, আমি যে তোমার চেয়ে পনেরো বছরেরও বড়।

ভাইয়ের হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকেন বড়দি; বারান্দায় উঠেই একটা কোচের উপর বসে পড়েন। নিজের গাড়িতে বসে রাঁচি থেকে আসতেই কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বড়দি।

কিন্তু ক্লান্তির কথা তুলে সুজীবনের সঙ্গে গল্প করবার জন্য বড়দি আসেন নি। যে কথাটা বলতে এসেছেন, সেই কথাটাই বলে দিলেন।—রঞ্জুর বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গিয়েছে। তুমি এবার এদিকের সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেল।

সুজীবন—রেলওয়েতে কাজ করে, সেই চমৎকার ছেলেটির সঙ্গেই কি …।

বড়দি—না। সে ছেলে নয়। এ ছেলে হল, রঞ্জুরই বন্ধু নমিতার দাদা দেবাশিস বসু। দেবাশিসের বাবা কলকাতার একজন স্টিভেডোর। দেবাশিস হল অটোমোবিল এঞ্জিনিয়ার। দেখতে সুন্দর। স্বাস্থ্য ভাল।

সুজীবন—এ ছেলের খোঁজও কি মণ্টু দিয়েছে?

বড়দি—না। খোঁজ হঠাৎ পাওয়া গেল। যাই হক, ছেলে যে খুবই ভাল, তাতে একটুও সন্দেহ নেই।

বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন। সুজীবনের চোখের পাতা যেন থরথর করে কাঁপছে। যে চোখে অনেক-দিন হল কড়া হুইস্কির নেশার কোন জ্বালা ফুটে ওঠে নি,

সেই চোখ লালচে হয়ে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। চেঁচিয়ে ওঠেন সুজীবন। —রঞ্জু নিজেই বোধ হয় খোঁজ দিয়েছে?

বড়দি—হ্যাঁ।

সুজীবন—ভালবাসা হয়েছে?

বড়দি—হ্যাঁ।

সুজীবন—কার ইচ্ছেতে এ ব্যাপার হল?

বড়দি—নমিতা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, রঞ্জুর ইচ্ছে। তাই দেবাশিস রাজি হয়েছে।

সুজীবন—কবে থেকে এ ব্যাপার চলছে?

বড়দি—নমিতা লিখেছে, প্রায় তিন বছর হল।

সুজীবন—কবে কোথায় কেমন করে দেবাশিসের সঙ্গে রঞ্জুর দেখা হল?

বড়দি—কনভেণ্ট থেকে ছুটির সময় নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে যে-ট্রেনে কলকাতায় ফিরত দেবাশিস, সেই ট্রেনেই রঞ্জুর সঙ্গে দেবাশিসের চেনাশোনা হয়েছে।

সুজীবন—তারপর?

বড়দি—দেবাশিসের কাছে অনেক চিঠি লিখেছে রঞ্জু। কাজেই ...।

সুজীবন—কি?

বড়দি—ছেলেটিও যখন শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে, তখন তো আর কোন সমস্যা নেই।

সুজীবন—বেশ চমৎকার গল্প শোনালে, বড়দি। বাঃ। মায়ের কীর্তিতে আর মেয়ের কীর্তিতে একটুও অমিল নেই। তুমিও কি ভুলে গিয়েছ যে, চারু রায়ের মেয়ে একদিন একটা

ট্রেনের কামরাতে সুজীবন সেনকে দেখে আর আলাপ করে, তারপর ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড ভালবাসা জমিয়ে ফেলেছিল ?

সারা গায়ে যেন আগুন লেগেছে, ছটফট করে উঠে দাঁড়ান সুজীবন। চেয়ারটার গায়ে একটা লাথি মেরেই সরে যান। ঘরের ভিতরে ঢুকে টেবিলের ফুলদানিটা তুলে নিয়ে আলমারির কাচের উপর আছাড় মারেন। ঝনঝনিয়ে আর্তনাদ করে আর টুকরো টুকরো হয়ে আলমারির কাচ ঘরের মেঝের কার্পেটের উপর ছড়িয়ে পড়ে। চিৎকার করেন সুজীবন,—স্টিফান, গেলাস দিয়ে যাও।

কিন্তু আলমারির কোথাও কোন হুইস্কির বোতল নেই।

খানসামা স্টিফানও ভয়ে ভয়ে দূরে সরেই থাকে, কাছে আসে না।

বড়দি দুই হাতে মুখ ঢেকে বারান্দার কোচের উপর অনড় হয়ে বসে থাকেন, আর হাঁপাতে থাকেন।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আবার বড়দির সামনে দাঁড়িয়ে যেন টলতে থাকেন সুজীবন।—খুব ভাল কথা বলেছ, বড়দি। যখন নিজেই ইচ্ছে করে ভালবেসে বিয়ে করছে রঞ্জু, তখন আর কোন সমস্যাই থাকতে পারে না। শুধু একদিন স্বামীর সঙ্গে রোম বেড়াতে যাবে, তারপর ফিরে এসেই স্বামীকে ছাড়বে। আর ঐ হতভাগ্য দেবাশিস সারা জীবন অপমানের জ্বালায় জ্বলবে।

বড়দির চোখ-ঢাকা দুই হাত ভিজে গিয়েছে। তবু হাত সরিয়ে নেন না বড়দি।

সুজীবন—তুমি কাঁদলে হবে কি? চারু রায়ের মেয়ে যে শুনতে পেলে হেসে হেসে লুটিয়ে পড়বে।

বড়দি—তুমি এখন একটু চুপ কর, জীবু।

সুজীবন—আমি একেবারেই চুপ হয়ে যাব বলে কয়েকটা কথা বলে নিচ্ছি। শুনতে চাও তো শোন।

বড়দি—বল।

সুজীবন—মণ্টুকে এখানে এসে রঞ্জুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে বল। আমি ওর মধ্যে নেই।

বড়দি—না থাকলে চলবে কেন?

সুজীবন—না। আমি চলে যাব।

বড়দি—তা হয় না।

—হতে হবে। এমন বিয়ে দেখতে আমার ভয় করবে। এমন বিয়ের আসরে থাকতেও আমার ঘেন্না করবে।

—এখনই কেন উতলা হয়ে ওসব বাজে কথা ভাবছ?

—আমি হুইস্কি খাই নি, বড়দি। বাজে কথা ভাবছি না, বলছিও না।

—রঞ্জুর উপর তুমি নিষ্ঠুর হতে পারবে না।

—না পারি পারব না; কিন্তু রঞ্জুকে ক্ষমা করতেও পারব না।

—এমন ভয়ানক কথা বলো না। রঞ্জুকে ক্ষমা করে দাও।

—তা হয় না বড়দি। ওর মাকে আমি এ-জীবনে ক্ষমা করতে পারি নি, পারলাম না, পারবোও না। রঞ্জুকেই বা ক্ষমা করব কেন? রঞ্জু যে সেই রাক্ষুসীটারই রক্তের বিষ।

কথা নেই বার্তা নেই, ফট্ করে এক ভদ্রলোকের ছেলেকে ভালবেসে বসে আছে। ছেলেটার জন্যে আমার দুঃখ হয় বড়দি। আজ বেচারার একটু সন্দেহ করবারও সাধ্যি নেই যে, একদিন ওকে একটা সুজীবন হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

বড়দি এবার রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন।—চুপ কর, জীবু।

সুজীবন—হ্যাঁ, চুপ করতেই হবে। রঞ্জু শেষ পর্যন্ত ওর মায়ের পক্ষেই চলে গেল। চারু রায়ের মেয়ে আজ বিনা মামলাতেই আমাকে হারিয়ে দিল। আমার আর কিছু বলবার নেই। শুধু শেষ কথাটি বলে দিচ্ছি; রঞ্জুর বিয়ে তোমরা দেখবে, আমি দেখব না।

ভিলা মাধবীর কয়েকটা ঝাউয়ের মাথায় মাকড়সার জাল ঝুলছে। সকালবেলার প্রথম রোদে কুয়াশা যখন গলে যায়, তখন ওই মাকড়সার জাল থেকে ছোট-ছোট জলের ফোঁটা চিকচিক করে কেঁপে-কেঁপে ঝরে পড়ে।

কিন্তু মালী চমনরাম আর দেরি করে নি। ঝাউয়ের গায়ে মই লাগিয়ে উপরে উঠেছে আর লম্বা বাঁশের খোঁচা দিয়ে দিয়ে মাকড়সার সব জাল ছিঁড়ে মুছে আর সরিয়ে ঝাউগুলিকে ছিমছাম করে দিয়েছে।

মজুর লাগিয়ে বাগানের শুকনো পাতা রোজই ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়ে, আর দূরের পাঁচিলের এক কোণে জড় করে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে মালী চমনরাম। লনের ঘাস আর যত ফুলগাছের ঝাড় নতুন করে ছেঁটে দিয়েছে। বাগানটাও পরিচ্ছন্ন হয়ে হাসছে। উৎসব আসন্ন, আর সাতটা দিনও বাকি নেই। ভিলা মাধবীও তাই খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরি হয়ে নিচ্ছে।

বেয়ারা শুকদেও খুব ব্যস্ত। লোক লাগিয়ে এত বড় বাড়িটার সব দরজা জানলার কপাট খড়খড়ি আর শার্সি ঘসা-মোছা করিয়েছে শুকদেও। সব কার্পেটের ধুলো মুছে নেওয়া হয়েছে।

এরই মধ্যে রাঁচি থেকে মণ্টু একবার এসেছে আর টাউনের অনাদিবাবুকে ডেকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আবার রাঁচি চলে

গিয়েছে। বাগানের ভিতরে একটা রঙীন সামিয়ানা তুলবেন অনাদিবাবু; আর চমৎকার করে ফুল আলো আর সিল্কের ঝালর দিয়ে সাজিয়েও দেবেন।

ভিলা মাধবীর ইউকালিপটাস রোজ বিকেলের বাতাসে আস্তে আস্তে মাথা দোলায়। বিকেলের পাখিগুলি গাছের পাতার ঝুরু ঝুরু শব্দের সঙ্গে ফুর্তি মিশিয়ে দিয়ে আর ডাকাডাকি করে উড়তে থাকে।

বড়দি তো আগে থেকেই আছেন। বড়দির টেলিগ্রাম পেয়ে এলাহাবাদ থেকে মণ্টুর শ্বশুর বিনয়বাবু এসে পড়লেন। রঞ্জু এখন বড়দির রাঁচির বাড়িতেই আছে। মণ্টুর বউ শোভা আর রঞ্জু একসঙ্গেই আসবে।

যা ব্যবস্থা করা দরকার তার সবই বড়দির সঙ্গে পরামর্শ করে বিনয়বাবু যথাসাধ্য করেছেন। ব্যবস্থা হয়েছে, কলকাতা থেকে যারা আসবে তারা জোন্স সাহেবের দিলখুশা ক্লাবের গেস্ট-হাউসে থাকবে। ওরা তো মাত্র সাতজন। দেবাশিস আর নমিতা; দেবাশিসের এক কাকা আর চারজন বন্ধু। কার্সিয়ং থেকে মিসেস ডি' সিলভাও আসবেন।

বড়দি বলেছেন, টাউনের অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হক। বিনয়বাবু তাই বার লাইব্রেরীর সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। রেজিস্ট্রার গুপ্তবাবু শুধু একা আসবেন না; তাঁর বাড়ির মেয়েরাও সবাই আসবেন।

ভিলা মাধবীর এত ব্যস্ততার মধ্যে শুধু একটি অলস উদাস স্তব্ধতা এক কোণে একেবারে নীরব হয়ে পড়ে আছে। একটি ঘরের ভিতরে কোচের উপর চুপ করে বসে থাকেন সুজীবন

সেন। এক হাতে পাইপ ; আর-এক হাতে শিকারের একটা পত্রিকা। হিমালয়ের স্নো-লেপার্ডের জীবনের গল্প খুব মন লাগিয়ে আর চোখে পুরু কাচের চশমা লাগিয়ে রোজই পড়ছেন সুজীবন সেন।

ওই পুরু কাচের চশমার ভারেই যেন সুজীবনের ঘাড়টা নুয়ে গিয়েছে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। সুজীবন সেনের ওই শরীরে একটু টান হয়ে দাঁড়াবারও শক্তি যেন আর নেই। কোচের উপর বসে আছেন, যেন তিন ভাগ হয়ে ভেঙে পড়ে রয়েছেন সেই সুজীবন সেন, একদিন যাঁর চেহারাকে একজন মিলিটারী জেনারেলের মত স্মার্ট চেহারা বলে মনে করেছিল কলেজের সায়েন্সের ছেলেরা।

কদিন আগে চলে যাবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সুজীবন। কিন্তু মণ্টুর শ্বশুর বিনয়বাবু অনেক করে বুঝিয়েছেন বলেই আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। বেশ মিনতি করে বুঝিয়েছেন বিনয়বাবু।—আপনি অন্তত বিয়ের দিনটা পর্যন্ত থাকুন সুজীবনদা ; নইলে লোকের চোখে ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে। আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না, কিছুই দেখতে হবে না, আপনি যেমন বসে আছেন তেমনই শুধু বসে থাকুন।

তাই বসে আছেন সুজীবন সেন। তাঁর কাছে আজ এই ভিলা মাধবী যেন তকতকে ঝকঝকে একটি জেলবাড়ি, তারই একটি আবছায়াময় কুঠুরির ভিতরে পনেরো বছরের শাস্তির মেয়াদ-খাটা একটি বুড়ো কয়েদীর মত খালাস পাওয়ার দিনটির অপেক্ষায় আছেন। সত্যিই সুজীবনের এই ঘরের জানলার

পর্দা সব সময়েই টানা থাকে ; বাইরের আলো-বাতাস হু হু করে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে না।

বড়দির গাড়িটা রাঁচি থেকে ছুটে এসে যখন লনের কাছে থেমেই হর্ন বাজিয়ে ভিলা মাধবীর বাতাসে একটা খুশির সাড়া জাগিয়ে তোলে, তখন বড়দির বুকটা দুর দুর করে কাঁপতে থাকে। জানেন বড়দি, কারা এসেছে। ঘণ্টা তিন আগে রাঁচি থেকে ফোন করেছিল মণ্টুর বউ শোভা—আমরা রওনা হচ্ছি।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছে মণ্টুর বউ শোভা, মণ্টুর ছেলেটা ; আর রঞ্জু।

মিসেস ডি' সিলভা অনেকবার খুশি হয়ে যে-কথাটা চিঠিতে লিখতেন, সেটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য একটি কথা। রঞ্জুর মুখের দিকে একবার তাকালেই বুঝতে আর বাকি থাকে না, মেয়েটা সত্যিই ফুলের মত সুখী, হ্যাপি লাইক এ ফ্লাওয়ার। চব্বিশ বছর বয়সের মেয়ে ; ওর ভালবাসার আশা ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। ওর স্বপ্ন যাকে কামনা করেছে, তাকেই জীবনে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ভগবান জানেন, এর মধ্যে কী ভুল থাকতে পারে।

বড়দির কাছে এসেই জিজ্ঞেস করে রঞ্জু—বাবা কোথায়, পিসি ?

বড়দি—ও-ঘরে আছে। কিন্তু···।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন বড়দি, কিন্তু বলা হল না।

রঞ্জু ওর মুখের ওই ফোটা-ফুলের হাসি উথলে দিয়ে ছুটে চলে গেল।

সুজীবনের কাছে এসে দাঁড়ায় রঞ্জু। সুজীবনের হাতের পত্রিকাটার দিকে একবার তাকায়। হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটাকে সুজীবনের হাত থেকে এক টান দিয়ে তুলে নেয় রঞ্জু।—এখনও স্নো-লেপার্ডের ছবি দেখছ? দেখছ না, আমি এসেছি?

সুজীবনের মুখের দিকে আর-একবার তাকিয়েই চমকে ওঠে রঞ্জু—কী হল? তুমি এত গম্ভীর কেন বাবা?

সুজীবন বলেন—তুমি এখন তোমার পিসির কাছে গিয়ে বস। আমাকে একা থাকতে দাও।

—কি বললে? সুজীবনের কাঁধের উপর হাত রেখে আস্তে একটা ঠেলা দেয় রঞ্জু।—তুমি বলেছিলে না, কখ্খনো গম্ভীর হবে না?

রঞ্জুর চোখ দুটো যেন ভয়ানক বিস্ময়ের খোঁচা লেগে একটা ব্যথা পেয়েছে; আর গলার স্বরেও একটা অভিমানের করুণ সুর বেজে উঠেছে।

বড়দি ঘরের ভিতরে ঢুকেই রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে কথা বলেন।—ভুল করছ রঞ্জু। জীবুর সঙ্গে ও-ভাবে কথা বলো না। জীবুর শরীর খুব খারাপ।

সুজীবনের একটা হাত শক্ত করে ধরে রঞ্জু।—তাই তো দেখছি, পিসি। তোমার শরীর এত খারাপ হয়ে গেল কেন বাবা?

বড়দি—আমার কথা শোন, রঞ্জু; জীবুকে এখন এভাবে বিরক্ত করে কথা বললেই তো ওর শরীর ভাল হয়ে যাবে না।

সুজীবনের হাত ছেড়ে দিয়ে রঞ্জু এবার সুজীবনের কানের কাছে মুখ এগিয়ে খুব মৃত্যুস্বরে কথা বলে—আচ্ছা, আমি এখন যাই, কেমন ? পরে আসব।

সারা তুপুর, সারা বিকেল, আর সারা সন্ধ্যা ; রঞ্জু বার বার বড়দিকে শুধু তুটি কথা জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করেছে।—বাবা এত গম্ভীর কেন, পিসি ? বাবার শরীর হঠাৎ এত খারাপ হয়ে গেল কেন পিসি ?

বড়দি বলেন—ভগবানের হাত ; তুমি আর আমি কি করতে পারি বল ?

রঞ্জু—কিন্তু আমার যে একটুও ভাল লাগছে না। কিছুই ভাল লাগছে না।

বড়দি—তুমি মন খারাপ করো না।

সন্ধ্যাবেলা লনের কাছে বসে রঞ্জুকে একটা কথা নিজেই ইচ্ছে করে বলে দিলেন বড়দি। —জীবুর এখন সিমলা স্যানাটোরিয়ামে চলে যাবার কথা। ওখানে থাকলেই শরীর ভাল হয়ে যাবে। এতদিনে চলেও যেত। কিন্তু তোমার বিয়ের দিনটা পর্যন্ত থাকা উচিত বলেই এখনও এখানে আছে।

কথা বলতে গিয়ে রঞ্জুর গলার স্বর উদাস হয়ে যায়।—সবই কেমন যেন হয়ে গেল, পিসি।

বড়দি—তুমি তুঃখ করো না। আর, তোমার বাবাকেও কোন কথা জিজ্ঞেসা করবে না। দেখছ না, আমিও ওর সঙ্গে খুব কম কথা বলছি। কেউ কোন কথা বললে আজকাল ওর খুব অস্বস্তি হয়।

পিসির উপদেশ মনে রেখেছে রঞ্জু। রোজই সকালে একবার, আর সন্ধ্যেবেলা একবার সুজীবনের ঘরে ঢুকে, সুজীবনেরই পাশে কোচের উপর চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে রঞ্জু। তারপর চলে যায়।

কিন্তু, কি আশ্চর্য! পিসির যেন তাতেও আপত্তি।—বার বার জীবুর কাছে গিয়ে ও-ভাবে বসে থেক না রঞ্জু। জীবুর অস্বস্তি হয়।

পিসির এই উপদেশ যেন একটা নির্মম মিথ্যের উপদেশ। রঞ্জু গিয়ে সুজীবনের পাশে কোচের উপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলে অস্বস্তি বোধ করবেন সুজীবন, এমন ভয়ানক বিস্ময় সহ্য করতে রাজি নয় রঞ্জু। রঞ্জু বেশ স্পষ্ট করেই বলে দেয়।—তা হয় না, পিসি। ওতে বাবার কোন অস্বস্তি হতেই পারে না। অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না। রুমাল তুলে বার বার চোখ মুছতে থাকে রঞ্জু।

বড়দিও আর কথা বাড়িয়ে রঞ্জুর সঙ্গে তর্ক করতে চান না। চুপ করেই থাকেন। জানেন বড়দি, এই তো, আর তো মাত্র একটা দিন। রঞ্জুকে আর এই নিষ্ঠুর উপদেশের কথাটা বলতে হবে না।

সকালবেলাতেই খবর দিলেন বিনয়বাবু—ওরা সবাই এসে গিয়েছে। মিসেস ডি' সিলভাও এসেছেন। দিলখুশা ক্লাবের গেস্ট হাউসের ব্যবস্থাও খুব ভাল হয়েছে। দেবাশিস ওর বন্ধুদেব নিয়ে লেক দেখতে বের হয়েছে। নমিতা বলেছে,

সন্ধ্যার পর সবারই সঙ্গে আসবে নমিতা ; আগে আসতে একটু অসুবিধে আছে।

বড়দি—তা নমিতা একটু আগে না এলেও চলবে। শোভা তো আছে, রঞ্জুকে সাজিয়ে দিতে পারবে।

সন্ধ্যা হতেই শোভা এসে রঞ্জুকে একটা ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়ে যায়। শোভা কিন্তু অনেক চেষ্টা করে আর সাধাসাধি করেও রঞ্জুকে খুব বেশি সাজতে রাজি করাতে পারল না।

রঞ্জু বলে—না বউদি। একটা নতুন শাড়ি পরেছি, এই যথেষ্ট। রং-টং মাখতে পারব না।

শোভা আশ্চর্য হয়।—কেন ?

—আমার ভাগ্য। বাবার মুখে হাসি নেই।

—ওঁর তো শরীর খারাপ।

—সেই জন্যেই তো বলছি; বেশি সাজগোজ করবার মানে হয় না। ভাল দেখায় না।

ভিলা মাধবীর গেট দিয়ে এক-একটি গাড়ি ঢুকছে আর লনের পাশে থামছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা একে একে আসতে শুরু করেছেন। মণ্টু ওদিকে ব্যস্ত আছে।

ভিলা মাধবীর বাগানে সামিয়ানার তলায় চেয়ার-পাতা আসর রঙীন আলোতে ঝলমল করছে। অনাদিবাবু সত্যিই বেশ সুন্দর করে আসর সাজিয়েছেন। যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে, সেখানে মস্ত বড় একটা কার্পেট পাতা হয়েছে। কার্পেটের চারদিকে আলো আর ফুলের স্তবকের একটা ঘেরান দিয়েছেন অনাদিবাবু।

বিনয়বাবু কিন্তু একটু উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তাই একটি ঘরের ভিতরে বড়দির সঙ্গে কথা বলছেন। —সুজীবনদা বলছেন, উনি সইটই করতে পারবেন না।

বড়দি—তাতে অবিশ্যি বিয়ে ঠেকে থাকবে না। আপনি আছেন, মণ্টু আছে, মিসেস ডি' সিলভাও থাকবেন; তিন সাক্ষীর সই থাকলেই বিয়ে হয়ে যাবে।

বিনয়বাবু দেখতে পান নি, বড়দিও না, ঘরের দরজার পর্দার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জু।

তাই বিনয়বাবু বেশ গলা খুলেই কথা বলেন আর আক্ষেপ করেন।—কিন্তু সুজীবনদা বিয়ের আসরে এসে একবার বসবেনও না, এটা কেমন কথা?

বড়দি—জীবু কি তাই বলছে?

বিনয়বাবু—হ্যাঁ। আমি তো আমার সাধ্যিমত অনেক অনুরোধ করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বুঝলেন না। রাজি হলেন না।

বড়দি—থাক তবে। জীবুকে আর ঘাঁটাবেন না। কোন লাভ হবে না।

বিনয়বাবু—কিন্তু…।

বড়দি—না। ঘা খাওয়া মানুষ, পনেরোটা বছর ধরে ওর মন জ্বলছে আর পুড়ছে। চারু রায়ের মেয়েকে এখনও জীবু যে কী ভয়ানক ঘেন্না করে, সেটা আমি দেখেছি, আপনারা দেখেন নি।

বিনয়বাবু—কিন্তু সেজন্যে নিজের মেয়ের বিয়ের ওপরেও রাগ করে আর অখুশি হয়ে…।

বড়দি—বুঝতে ভুল করছেন। চারু রায়ের মেয়ে ঠিক যেমনটি নিজে ইচ্ছে করে জীবুকে ভালবেসেছিল আর বার বার চিঠি লিখে জীবুকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল, রঞ্জুও যে ঠিক তাই করেছে। দেখলেন তো, চারু রায়ের মেয়ের সে ভালবাসা কী সাংঘাতিক একটা মিথ্যে। একটা মানুষকে অপমান করে মেরে রেখে দিয়ে কোথায় সরে পড়ল।

বিনয়বাবু হাসতে চেষ্টা করেন। —ওটা একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা মাত্র। সবাই কি আর চারু রায়ের মেয়ের মত···।

বড়দি—সেটা আমরা বুঝি বিনয়বাবু। কিন্তু যে মানুষ ঘা খেয়েছে, অপমানে পুড়েছে, ভালবাসার জঘন্য কাণ্ড দেখে যার বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে, সে কি করে আজ খুশি হবে? জীবু যে খুব আশা করেছিল, রঞ্জু ওর মায়ের মত হবে না। যাই বলুন আপনি, আর আমিও জীবুর গোঁয়ার্তুমিকে যতই নিন্দে করি, আমিও তো দেখছি, আজ পর্যন্ত যা হয়েছে রঞ্জু, আর যা করল রঞ্জু, সবই ঠিক ওর মায়েরই মত। দেখতেও ঠিক মায়ের মত; ভালবাসাবাসি করল ঠিক মায়েরই মত। এরপর, অবিশ্যি ভগবান না করুন···।

দরজার পর্দা সরিয়ে রঞ্জু বলে ওঠে।—আর বলতে হবে না, পিসি। দুঃখ করো না। কোন চিন্তাও করো না।

চলে যায় রঞ্জু।

বিনয়বাবু চমকে ওঠেন। আর বড়দির চোখ দুটো ভয় পেয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপরেই কাঁদতে থাকেন আর ডাকতে থাকেন বড়দি—রঞ্জু, রঞ্জু, একবার আমার কাছে এসে একটা কথা শুনে যাও।

রঞ্জু আসে না।

বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বড়দির কান্নার চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে। —এ কী বিপদ ডেকে আনলাম বিনয়বাবু! রঞ্জু কোথায় গেল?

বিনয়বাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জবাব দেন—সুজীবনদার ঘরে। কিন্তু আপনি বিচলিত হবেন না। আপনি বরং বারান্দায় এসে শান্ত হয়ে বসে থাকুন। ভদ্রলোকেরা আসতে শুরু করেছেন।

বুকের ভিতরে দুঃসহ একটা অপরাধের জ্বালা নিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে থাকেন বড়দি। শান্ত হয়ে থাকতেই চেষ্টা করেন।

বিনয়বাবু এসে বলে গেলেন, রেজিস্ট্রার গুপ্তবাবু এসে গিয়েছেন।

গুপ্তবাবুর বাড়ির মেয়েরাও গাড়ি থেকে নামছে। বড়দি তাঁর উতলা মনটাকে প্রাণপণে সংযত করে ডাকতে থাকেন। —ও শোভা, কোথায় তুমি?

মণ্টুর বউ শোভা ততক্ষণে নিজেই এগিয়ে গিয়ে গুপ্তবাবুর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

ভিলা মাধবীর ঝাউ আর ইউকালিপটাস দুলছে। মণ্টুর ছেলেটা এলোপাথাড়ি হাত চালিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। হর্ন বাজিয়ে আর ভিলা মাধবীর গেটের উপর আলো ছড়িয়ে দিয়ে এক-একটি গাড়ি ঢুকছে।

মণ্টু এসে ব্যস্তভাবে কথা বলে—সবাই এসে গিয়েছে। দিলখুশা ক্লাব থেকে আর কারও আসতে বাকি নেই।

দেবাশিস আর ওর বন্ধুরা চা খাচ্ছে। দেবাশিসের কাকা বাবার সঙ্গে গল্প করছেন।

বড়দি—বেশ তো, তুমিও এখন ওদিকেই থাক। এদিকে একটু দেরি আছে।

মণ্টু—কিন্তু নমিতা আর মিসেস ডি' সিলভা রঞ্জুর কাছে একবার আসতে চাইছেন। কোথায় রঞ্জু?

বড়দির গলার স্বর কাঁপে।—জীবুর কাছে বসে আছে।

—কাঁদছে নাকি?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—এখন কাঁদতে বারণ করে দাও। ওসব পরে হবে।

বড়দি—দেখি। কিন্তু তোমরা এত তাড়াহুড়ো করো না মণ্টু।

মণ্টু চলে যেতেই, বড়দি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বুকভরা আতঙ্কের ভার সামলাতে গিয়ে টলে ওঠেন। দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর খুব আস্তে-আস্তে হেঁটে সুজীবনের ঘরের দরজার কাছে এসেই পর্দা সরিয়ে ডাক দিলেন বড়দি—রঞ্জু, এস।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় রঞ্জু—যাচ্ছি, পিসি।

হাসছে রঞ্জু; সুজীবনের হাতের উপর হাত রেখে বসে আছে। কে জানে এতক্ষণ ধরে সুজীবনের কাছে কী কথা আর কত কথা বলে নিয়েছে মেয়েটা। বড়দির চোখ দুটো শুধু আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে। জীবু কিন্তু তেমনই গম্ভীর হয়ে আর চুপ করে একটা অবিচল পাথরের মত বসে আছে।

রঞ্জু বলে—তুমি বিশ্বাস কর বাবা, আমি তোমার চেয়েও বেশী ঘেন্না করি।

উঠে দাঁড়ায় রঞ্জু। ঘরের বাইরে এসেই বড়দির দিকে তাকিয়ে আর একটা হাঁপ ছেড়ে হেসে ফেলে।—বিয়ে হবে না পিসি।

বড়দি নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন। রঞ্জু হাত বাড়িয়ে বড়দির একটা হাত ধরে ফেলে।—

বড়দিকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বারান্দার চেয়ারের উপরে বসিয়ে দিয়েই রঞ্জু বেশ শান্তভাবে কথা বলে—বউদির বাবাকে বলে দাও, বিয়ে হবে না। যদি দরকার হয়, তবে আমি সবারই কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব।

বড়দি—পাগলের মত কথা বলো না, রঞ্জু।

রঞ্জু—না পিসি। এত লজ্জা আর এত ভয় নিয়ে আমি বিয়ে করতে পারব না।

—রঞ্জু, আমার কথা শোন। কাঁদতে থাকেন বড়দি। —ভদ্রলোকের ছেলেকে এ-ভাবে অপমান করো না।

রঞ্জু—দশ বছর পরে তাকে অপমান করে মেরে ফেলার চেয়ে, এখনই শুধু এক কথায় সামান্য একটু আশ্চর্য করে দিয়ে সরিয়ে দেওয়াই ভাল।

বড়দি—না না রঞ্জু, নিজেকে মিছিমিছি এত গালমন্দ করো না। তুমি লক্ষ্মীমণি, তুমি সুজীবন সেনের মেয়ে, তুমি প্রশান্ত সেনের মত মানুষের নাতনি। তুমি কেন নিজেকে এমন ভয়ানক অবিশ্বাস করবে ?

দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জু। —সব বুঝেও কিছুই বুঝতে পারছি না, পিসি।

রঞ্জুকে জড়িয়ে ধরেন বড়দি—তুমি তো মা-মরা মেয়ে।

আমরা তোমাকে মানুষ করেছি। আমরা যা, তুমিও তা। সেই জঘন্য অবিশ্বাসের মানুষটার সঙ্গে তো তোমার কোন সম্পর্কই নেই।

রঞ্জু কথা বলে না। কিন্তু অদৃশ্য প্রতিধ্বনির মত হঠাৎ কেউ যেন কথা বলে উঠল।

—সত্যিই ট্রেসপাস করেছি। মাপ করবেন।

বারান্দার সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন এই অদ্ভুত কথাটা বলে উঠেছে। চোখে কম দেখেন বড়দি, তাই চোখ টান করে তাকিয়ে থাকেন আর চিনতে চেষ্টা করেন।

কথা বলছেন সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমা। সাদা ধবধবে আদ্দির পাড়ছাড়া শাড়ি, পায়ে সাদা জুতো, মাথার খোঁপাটা একটা ধবধবে সাদার স্তবক; রেবা মাসিমা বেশ করুণভাবে হেসে-হেসে কথাটা বলছেন।

রেবা মাসিমার ঠিক পিছনে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছেন। এক প্রৌঢ়া মহিলা। চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি, সাদা লেসের ব্লাউজ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, আর পায়ে ধূসর শামোয়ার জুতো।

বড়দির দিকে তাকিয়ে রেবা মাসিমা আবার হাসতে চেষ্টা করেন।—আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন বলেই আপনার কাছে এসে কথাটা বলতে চাইছি।

বড়দি—বলুন।

রেবা মাসিমা—শত হক, আইন-টাইনের চেঁচামিচি করে যে যা-ই বলুক না কেন, রঞ্জু তো মাধুরই মেয়ে।

বড়দি—না, রঞ্জু আপনাদের মাধুর মেয়ে নয়।

রেবা মাসিমা—এটা একটা রাগের কথা বললেন, অবিশ্যি রাগ করতে পারেন আপনারা।

বড়দি—আজ হঠাৎ এক-যুগ পরে এখানে এসে আপনিই বা এসব কথা তুলছেন কেন ?

রেবা মাসিমা—আজ তো রঞ্জুর বিয়ে।

বড়দি—হ্যাঁ।

রেবা মাসিমা—খবরটা অবিশ্যি কদিন আগেই পেয়েছি ; কিন্তু···।

বড়দি—আমরা তো আপনাকে কোন খবর দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না।

রেবা মাসিমা—না না, সে-কথা বলছি না। খবরটা আপনাদের খানসামা স্তিফানের কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছি। কাজেই খবরটা মাধুকেও জানিয়েছিলাম।

বড়দি—সে কথাটা এখানে এসে আমাদের জানিয়ে লাভ কি ?

রেবা মাসিমা—তাই মাধু এসেছে।

বড়দি—কি বললেন ?

রেবা মাসিমা—আপনারা বিরক্ত হবেন না ; আপত্তি করবেন না। মাধু শুধু চুপ করে, বলেন তো আড়ালে এক কোণে দাঁড়িয়ে, ওর মেয়ের বিয়ে দেখেই চলে যাবে।

চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, প্রৌঢ়া মহিলা তাঁর মাথার

কাপড়টা একটু টেনে বড় করে দিয়ে রেবা মাসিমার পিছন থেকে এগিয়ে এসে সিঁড়িটার শেষ ধাপের কাছে দাঁড়ালেন।

চেঁচিয়ে ওঠেন বড়দি—আপনি এসেছেন কেন? বড়দির চোখের দৃষ্টিটা জ্বলতে থাকে।

মহিলা কিন্তু বড়দির এত কঠোর ধমকের শব্দটাও শুনতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ। দুই চোখ অপলক করে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বড়দি তাঁর গলার স্বরে যেন এক-সাগর বিষ ঢেলে দিয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠেন—চারু রায়ের মেয়ের আবার এরকম ভিখিরিনীর ঢঙ কেন? না, কোন মানে হয় না, আপনার এখানে আসা একটুও উচিত হয় নি।

সিঁড়ি ধরে নামতে থাকেন বড়দি। বড়দির রুক্ষ কঠোর মুখটা যেন একটা প্রতিজ্ঞা। এই বে-আইনী আবির্ভাবকে এখনই চরম কথা বলে দিয়ে বিদায় করে দিতে চাইছেন বড়দি।

সিঁড়ি ধরে নেমে আসে রঞ্জু। মাধবীলতার চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়! এক যুগের অন্ধকারের ওপার থেকে আজ হঠাৎ ইনি কি মনে করে মেয়ের বিয়ে দেখতে এসেছেন? জলে ভরে গিয়েও রঞ্জুর চোখ দুটো যেন চিকচিক করে আগুনের কণা ছুঁড়ছে। চেঁচিয়ে ওঠে রঞ্জু—আপনি কেন এসেছেন?

কিন্তু ঘরের দরজার পর্দা নড়ে ওঠে; একটা কঠিন শাসনের প্রাণ উদ্বিগ্ন হয়ে আর রঞ্জুকে ধমক দিয়ে বের হয়ে আসে।

—ও কি হচ্ছে রঞ্জু? ছিঃ, ওভাবে কথা বলতে নেই। এত বড় হয়েছ, কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, জান না?

চমকে ওঠে রঞ্জু। চমকে ওঠেন বড়দি। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছেন সুজীবন সেন। হাতে পাইপ, সাদা জিনের ট্রাউজার, বুকের বোতাম খোলা একটা ঢিলে কামিজ আর পায়ে স্লিপার; ঘাড়টা ঝুঁকে পড়েছে, কাঁধটা দুপাশে বেশ উঁচু হয়ে গিয়েছে। বারান্দার উপর একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়েছেন সুজীবন।

কি বলতে চাইছেন সুজীবন? শুধু বড়দি আর রঞ্জু নয়, এই সন্ধ্যায় ভিলা মাধবীর যত আলো আর ফুলও যেন বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।

সুজীবন বলেন—শোভাকে একবার ডাক বড়দি। রঞ্জুকে নিয়ে যাক।

রঞ্জু চেঁচিয়ে ওঠে।—আমাকে কোথায় যেতে বলছ বাবা?

সুজীবন—যাও, এবার বস গিয়ে।

রঞ্জু—না, বিয়ে হবে না।

সুজীবন—আমি বলছি, হবে।

রঞ্জুর গলার স্বর কাঁপতে থাকে।—তবু ভয় করছে, বাবা।

সুজীবন—কোন ভয় নেই। আমি বলছি, কোন ভয় নেই।

শোভা নিজেই ব্যস্তভাবে ছুটে এসেছে। কারণ গুপ্তবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেছেন—আর দেরি কিসের?

সুজীবন বলেন—যাও, রঞ্জু।

রঞ্জু তবু অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রেবা মাসিমা আবার করুণভাবে হাসেন।—মনে হচ্ছে, রঞ্জুরই আপত্তি। বোধহয় রঞ্জুর ইচ্ছে নয় যে, আমরা ওর বিয়ে দেখি। আমরা তাহলে যাই।

রেবা মাসিমা এবার মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—চল মাধু।

মাধবীলতাও বলেন—হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান।

সিঁড়ি ধরে এগিয়ে গিয়ে, সুজীবনের মুখের দিকে না তাকিয়ে, সুজীবনের কাছে একবার দাঁড়ালেন মাধবীলতা। তারপর ঝুঁকে পড়লেন, পায়ে হাত দিলেন, আর সোনার চশমাটাও চোখ থেকে ফস্‌কে গিয়ে কার্পেটের উপর পড়ে গেল।

মাধবীলতাই জানেন, এমন একটা কাণ্ড হঠাৎ কেন করে বসলেন? আইন-টাইন ভুলে গিয়ে এক-যুগ আগের একটি চেনা মানুষকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়েছে? না, রঞ্জুর ভয় ভাঙাতে ইচ্ছে হয়েছে?

কার্পেটের উপর থেকে চশমাটা তুলে নিয়েই আবার সিঁড়ি ধরে নেমে এসে রেবা মাসিমার কাছে দাঁড়ালেন মাধবীলতা। রঞ্জুর মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে নিলেন।

মণ্টুর বউ শোভা ডাকে—চল রঞ্জু।

সুজীবনের দিকে তাকায় রঞ্জু—যাই, বাবা।

সুজীবন—এস।···শুনছ বড়দি?

বড়দি—বল।

সুজীবন—তুমি তোমার সঙ্গে ওঁদেরও নিয়ে যাও। বিয়ে দেখে তারপর ওঁরা যাবেন।

পাইপ মুখে দিয়ে সাদা মাথাটি আস্তে-আস্তে দুলিয়ে, ঘাড় কুঁজো করে আস্তে-আস্তে হেঁটে হেঁটে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন সুজীবন সেন।

বিয়ে যখন শেষ হয়েছে, তখন বিয়ের আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন স্থজীবন সেন। গায়ে ফ্লানেলের লম্বা কোট, হাতে মালাক্কা বেতের একটি স্টিক। সবারই দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আর ছুই হাত তুলে নমস্কার জানালেন স্থজীবন। স্টিকটাও সেই নমস্কারের জোড়বাঁধা হাতের সঙ্গে ঝুলতে থাকে।

জ্ঞানবাবু বলেন—ওঃ, সেনসাহেবের শরীর সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আদিত্যবাবু বলেন—কিন্তু সেনসাহেবের মুখের সেই হাসিটা ঠিক তেমনই আছে।

রঞ্জু আর দেবাশিসের কাছে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন স্থজীবন। রেজিস্ট্রার গুপ্তবাবুকে ধন্যবাদ জানান। তারপর মালাক্কা বেতের স্টিকের উপর ভর দিয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যান।

ড্রাইভার মোতিরাম গাড়ি ঠিক করেই রেখেছিল। গাড়িতে উঠে বসলেন স্থজীবন। বড়দি ছুটে এলেন, বিনয়বাবু এসে অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু স্থজীবনের ইচ্ছাটাকে কেউ টলাতে পারলেন না। স্থজীবন শুধু হেসে হেসে একটি কথা বললেন—না, আর এখানে এক মিনিটও না।

কেউ না বুঝুক, অন্তত বড়দি বুঝতে পারলেন, স্থজীবন যেন একটা ভয়ানক অপেক্ষার ছুঃখ মুছে দিয়ে, হাল্কা হয়ে, শান্ত হয়ে, খুশি হয়ে আর তৃপ্ত হয়েই চলে যাচ্ছে। যাক স্থজীবন; রঞ্জু না হয় একটু কাঁদবে। কিন্তু স্থজীবনের শরীরটা তো সত্যিই খুব খারাপ হয়েছে। ভগবান করুন, সিমলার স্যানে-টোরিয়ামে থেকে ওর শরীর যেন ভাল হয়।

ভিলা মাধবীর ফটক পার হয়ে চলে গেল সুজীবনের গাড়ি।

এক রাতের উৎসবের পর ভোর হতেই ভিলা মাধবীর বাগানে কোকিল ডাকতে থাকে। আর দুপুর হতে হতেই ভিলা মাধবীর ঘরের কলরব শেষ হয়ে যায়। সবাই চলে গিয়েছে। অনাদিবাবু এসে তাঁর সামিয়ানাও নিয়ে চলে গেলেন।

আজ এ-বাড়িতে মাধবী নামে কোন মানুষ নেই, মাধবী নামে কোন লতাও নেই। মাধবী নামটা একটা লেখা হয়েও কোথাও নেই। তবু লোকে বলে, ভিলা মাধবী।